শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ·১৪০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু, পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভুত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত' ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS VISHAL BOOK CENTRE 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাঁটুল দি গ্রেট

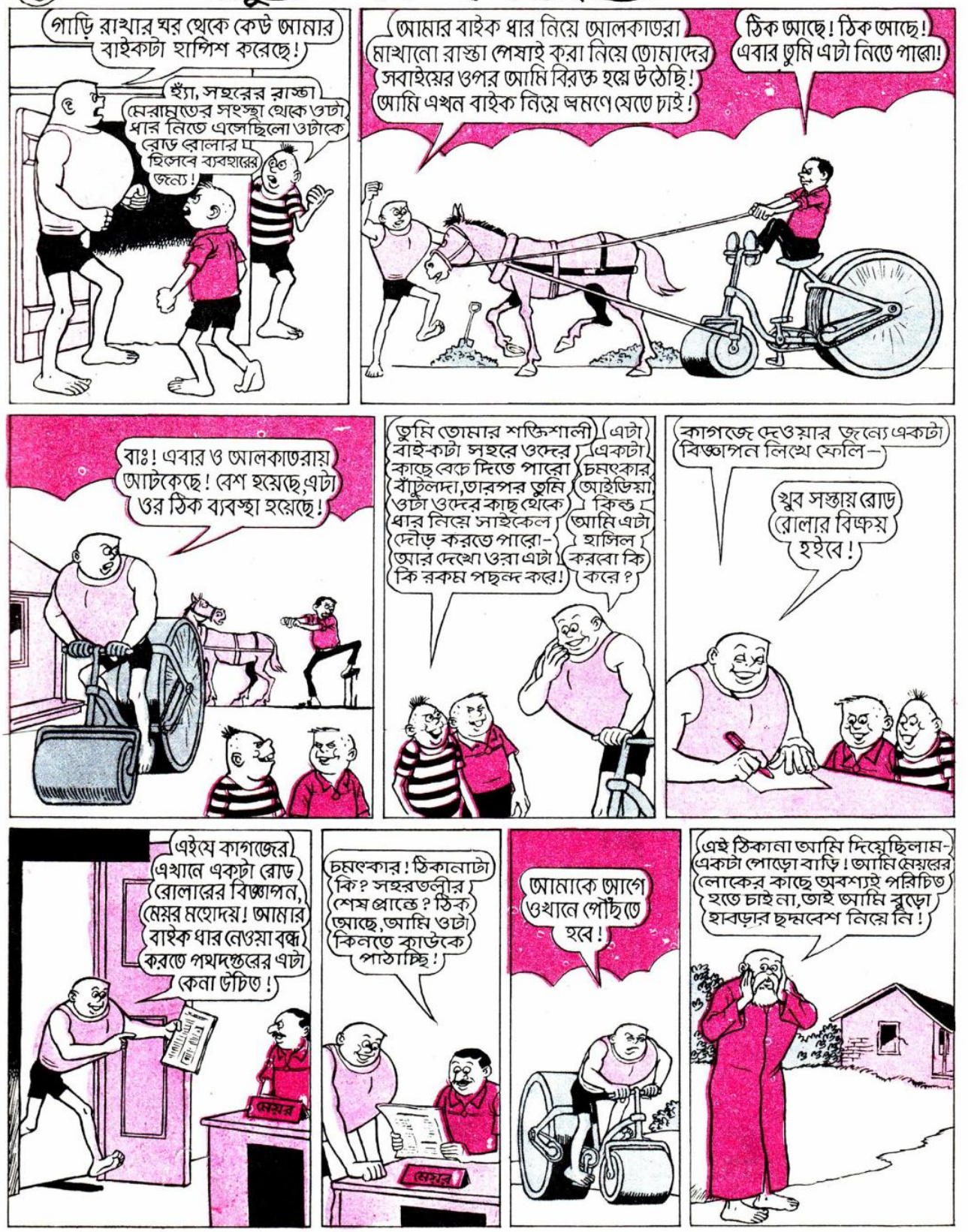
গাড়ি রাখার ঘর থেকে কেউ আমার বাইকটা হাপিশ করেছে!
হ্যাঁ, সহরের রাস্তা মেরামতের সংস্থা থেকে ওটা ধার নিতে এসেছিলো ওটাকে রোড রোলার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে!
আমার বাইক ধার নিয়ে আলকাতরা মাখানো রাস্তা পেষাই করা নিয়ে তোমাদের সবাইয়ের ওপর আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি! আমি এখন বাইক নিয়ে ভ্রমণে যেতে চাই!
ঠিক আছে! ঠিক আছে! এবার তুমি এটা নিতে পারো!
বাঃ! এবার ও আলকাতরায় আটকেছে! বেশ হয়েছে,এটা ওর ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে!
তুমি তোমার শক্তিশালী বাই-কটা সহরে ওদের কাছে বেচে দিতে পারো বাঁটুলদা,তারপর তুমি ওটা ওদের কাছ থেকে ধার নিয়ে সাইকেল দৌড় করতে পারো!- আর দেখো ওরা এটা কি রকম পছন্দ করে!
এটা একটা চমৎকার আইডিয়া কিন্তু আমি এটা হাসিল করবো কি করে?
কাগজে দেওয়ার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন লিখে ফেলি—
খুব সস্তায় রোড রোলার বিক্রয় হইবে!
এইযে কাগজের এখানে একটা রোড রোলারের বিজ্ঞাপন, মেয়র মহোদয়! আমার বাইক ধার নেওয়া বন্ধ করতে পথদপ্তরের এটা কেনা উচিত!
মেয়র
চমৎকার! ঠিকানাটা কি? সহরতলীর শেষ প্রান্তে? ঠিক আছে,আমি ওটা কিনতে কাউকে পাঠাচ্ছি!
মেয়র
আমাকে আগে ওখানে পৌঁছতে হবে!
এই ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম- একটা পোড়ো বাড়ি! আমি মেয়রের লোকের কাছে অবশ্যই পরিচিত হতে চাই না,তাই আমি বুড়ো হাবড়ার ছদ্মবেশ নিয়ে নি!

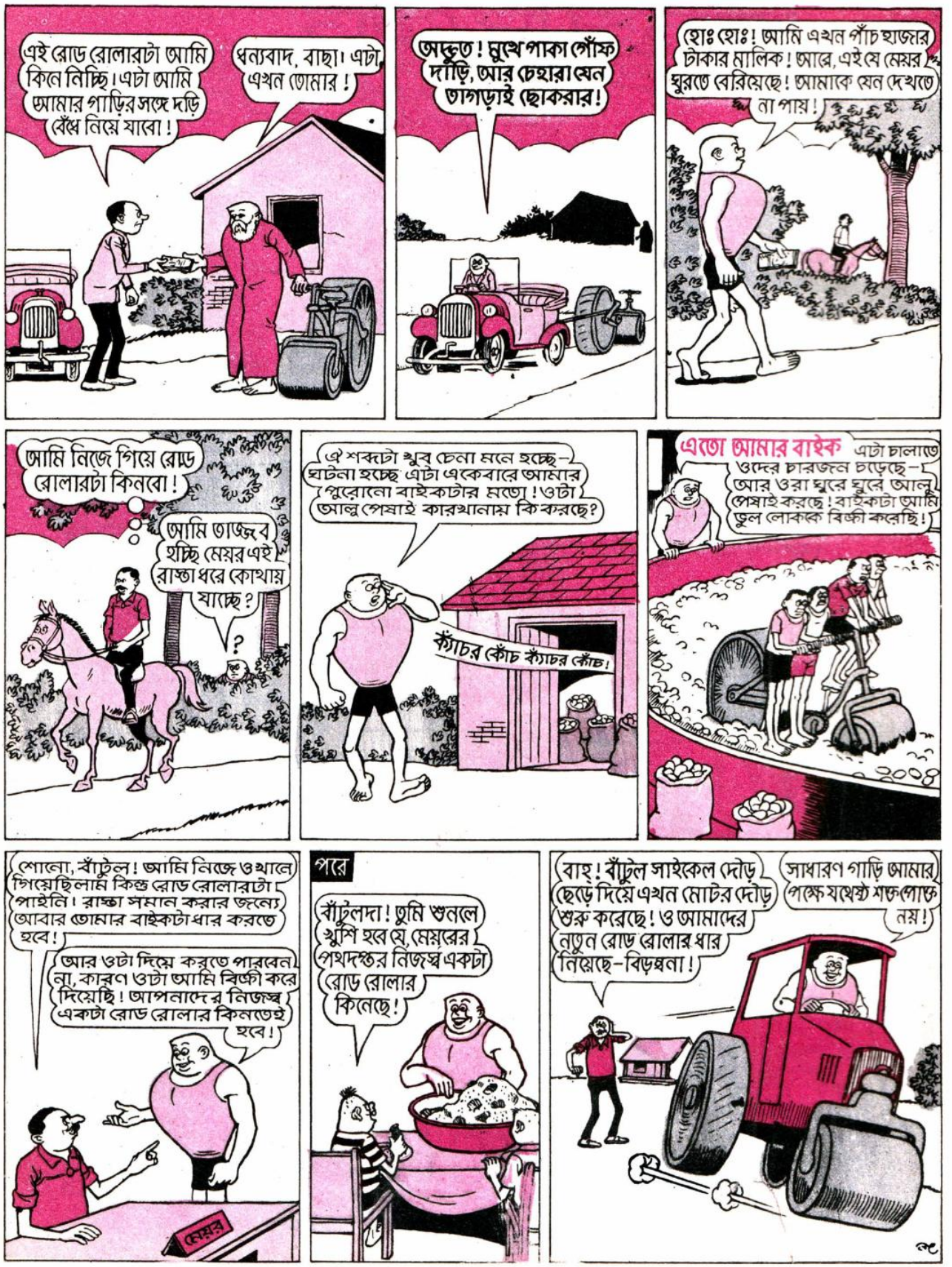
এই রোড রোলারটা আমি কিনে নিচ্ছি। এটা আমি আমার গাড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবো!
ধন্যবাদ, বাছা। এটা এখন তোমার!
অদ্ভুত! মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি, আর চেহারা যেন তাগড়াই ছোকরার!
হোঃ হোঃ! আমি এখন পাঁচ হাজার টাকার মালিক! আরে, এই যে মেয়র ঘুরতে বেরিয়েছে! আমাকে যেন দেখতে না পায়!
আমি নিজে গিয়ে রোড রোলারটা কিনবো!
আমি তাজ্জব হচ্ছি মেয়র এই রাস্তা ধরে কোথায় যাচ্ছে?
ঐ শব্দটা খুব চেনা মনে হচ্ছে— ঘটনা হচ্ছে এটা একেবারে আমার পুরোনো বাইকটার মতো! ওটা আলু পেষাই কারখানায় কি করছে?
ক্যাঁচর কোঁচ ক্যাঁচর কোঁচ!
এতো আমার বাইক
এটা চালাতে ওদের চারজন চড়েছে— আর ওরা ঘুরে ঘুরে আলু পেষাই করছে! বাইকটা আমি ভুল লোককে বিক্রী করেছি!
শোনো, বাঁটুল! আমি নিজে ও খানে গিয়েছিলাম কিন্তু রোড রোলারটা পাইনি। রাস্তা সমান করার জন্যে আবার তোমার বাইকটা ধার করতে হবে!
আর ওটা দিয়ে করতে পারবেন না, কারণ ওটা আমি বিক্রী করে দিয়েছি! আপনাদের নিজস্ব একটা রোড রোলার কিনতেই হবে!
মেয়র
পরে
বাঁটুলদা! তুমি শুনলে খুশি হবে যে, মেয়রের পথদপ্তর নিজস্ব একটা রোড রোলার কিনেছে!
বাহ! বাঁটুল সাইকেল দৌড় ছেড়ে দিয়ে এখন মোটর দৌড় শুরু করেছে! ও আমাদের নতুন রোড রোলার ধার নিয়েছে— বিড়ম্বনা!
সাধারণ গাড়ি আমার পক্ষে যথেষ্ট শক্তপোক্ত নয়!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

শ্রাবণ ১৪০০
জুলাই ১৯৯৩

প্রচ্ছদ ☐
স্বর্ণখনির অন্তরালে—নারায়ণ দেবনাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি ☐
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ —স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০

ধারাবাহিক ☐
অরণ্যপতি টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) —সব্যসাচী ৩৮
জঙ্গল রহস্য (উপন্যাস) —শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ☐
বরফচাপা খনি—সঙ্কর্ষণ রায় ২০

রূপকথার গল্প ☐
সারমেয়—রাধাকিশোর গোস্বামী ১০

ভূতের গল্প ☐
যমজ বোন—বরুণ দত্ত ৩৪

আবিষ্কারের গল্প ☐
কলম্বাসের উত্থান-পতন —প্রমিত রায়চৌধুরী ২৮

জীবন থেকে নেওয়া ☐
স্যান্ডি ম্যাকের গল্প —আরতি বসু ৬৯

পুরস্কৃত গল্প ☐
স্যার (প্রথম)—গার্গী বসু ৪৬
শিক্ষা (দ্বিতীয়)—শংকর চক্রবর্তী ৪৭

অগ্নিযুগের সৈনিক ☐
চাপেকার ভাইদের ফাঁসি —প্রিয়রঞ্জন মৈত্র ১২

ফিচার ☐
চিরন্তনী—তপন দাম ৪৮
ভবিষ্যতের ঠিকানা —অসিতকুমার চৌধুরী ৪৪
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪১

বিশ্ববিচিত্রা ☐
জিজ্ঞাসা ৬৫
সত্যি! ৬৮

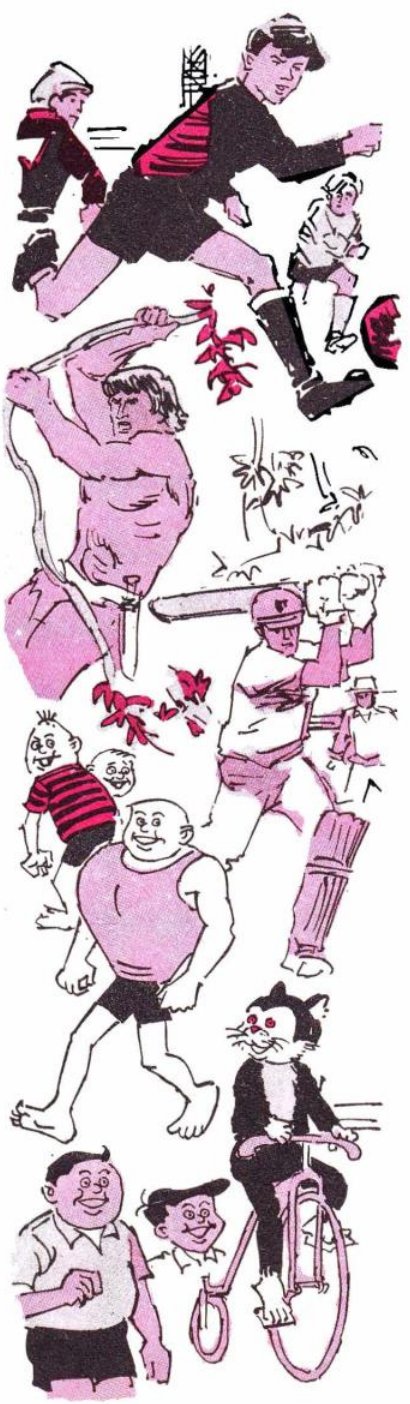

কবিতা ☐
নামের পরিণাম—ননীলাল দে ৫

বিভাগীয় লেখা ☐
খেলা—শা.প্রি.ব ৫৩
ক্লাব পরিচিতি—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
পড়ার সঙ্গে খেলা —মিহির দাশ ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম —তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৬৩

ছবিতে গল্প ☐
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন) —ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন) —নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৩২
বিলির বুট (রঙিন) ৬৬
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স ৪২

ঘোষণা ☐
নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৬০
জানো কী ৪৫

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকে ঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কমপ্লানেই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ।

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সবদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে। আর প্রোটিন-ই হল সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ, যা সরাসরিভাবে এই বেড়ে উঠায় সাহায্য করে। তাই আপনার ছেলেমেয়েদের অবশ্যই চাই কমপ্লান।

কমপ্লানে আছে ২০% মিল্ক প্রোটিন, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে আদর্শ প্রোটিন। এছাড়াও, এতে আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ, যা ওদের সবদিকেই সুস্থ-সবল ভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

৪৬শ বর্ষ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● শ্রাবণ ১৪০০ / জুলাই ১৯৯৩

নামের পরিণাম

নবীলাল দে

দাঁড়কাক কখনও
নাহি বসে দাঁড়ে,
দারুচিনি চিনি নয়
তা কি হতে পারে?
পানিফলে পানি নেই,
শুধু জলে ফলে,
টিকটিকি টিকি নয়,
ঘুরে ফিরে চলে।
আরশোলা শোলা নয়
ভয়ে গাটা হিম,
ঘোড়া নাহি ডিম পাড়ে
তবু ঘোড়ার ডিম।
জার্মানীর রাজধানী
বন নহে বন,

গোলদীঘি গোল নয়
চৌকনাই হন।
আস্তাকুঁড়ে কুঁড়ে নয়
আবর্জনায় ঠাসা,
আস্তাবল বল নয়
ঘোড়াদের বাসা।
কাটমাণ্ডু কাটা নয়
মাথা আছে ধড়ে
মাথাভাঙা ভাঙা নয়
লোক বাস করে।
কবিরাজ রাজা নয়
বৈদ্য বলা সাজে,
করতাল তাল নয়
ঝনঝন বাজে।

ছবি: অমল চক্রবর্তী

জঙ্গল রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়

অসহায় তিনটি মেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো পুকুরটার ধারে। টর্চের আলোয় ওরা দেখতে পাচ্ছে বালতিটা পড়ে আছে এক পাশে। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক কানে আসছে। দূরে ওদের তাঁবুতে সামান্য আলোর রেখা। ওরা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। বাবুকে আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো না। এখন রাজা নিখোঁজ।

মোমা কেঁদে ফেললো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, ছেলেধরারা বাবুদাদা, রাজাদাদাকে ধরে নিয়ে গেছে। এবার আমাদের ধরবে।

অন্য সময় হলে মিউ তাড়া দিতো। এখন কিছু বললো না। আসলে ওর মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। এই রাত্তির বেলায় কোথায় খুঁজবে বাবুদাদাকে, রাজাদাদাকে। বাবুদাদার বেলায় কুমীর ধরে নিয়ে যাবার যে সম্ভাবনার কথা ওদের মনে হয়েছিলো তা তো এখানে খাটবে না। আর যাই হোক এত দূরে এসে কুমীর রাজাদাদাকে ধরবে না। সেরকম কিছু হলে রাজাদাদা তো চিৎকারও করতে পারতো। তাহলে তাঁবুতে বসেই ওরা শুনতে পেতো। কিন্তু তা করেনি রাজাদাদা। তাহলে ?

মিউ আস্তে আস্তে বললো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। চল তাঁবুতে যাওয়া যাক। তাছাড়া রাত্তিরে তো কিছুই করা যাবে না। যা করার কাল সকালে করতে হবে।

মিউ-এর পেছন পেছন মোমা আর বুয়া তাঁবুর পথ ধরলো।

রাত্তিরটা যে ওদের কিভাবে কাটলো তা শুধু ওরাই জানে। ভয়ে, ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় তিনটি মেয়ে কাঁটা হয়ে প্রায় সারাটা রাত জেগে বসে রইলো। আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে—এই বুঝি ছেলেধরারা ওদের তাঁবুতে হানা দেয়।

ভোরের আলো ফুটতেই মিউ এসে বাইরে দাঁড়ালো। সারা রাত জেগে থাকার পর মোমা আর বুয়া শেষ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই মিউ ওদের ডাকেনি। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল এখন কি করবে, কমলদাকেই বা কি ভাবে খবর দেবে। অথচ একটা কিছু এখনই করার দরকার। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মিউ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সামনে ধুপ করে শব্দ হওয়ায় ও চমকে তাকালো। একটা বাঁদর কাছে এসে ওকে ইশারায় ডাকছে। মিউ কাছে যেতেই কিচিরমিচির করে কিছু বললো। জন্তু-জানোয়ারদের ভাষা মিউ বুঝতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটলো বাঁদরটার পেছনে। কিকি যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটা গাছের ডালে বসেছিল মিউ তা জানতো না। তাই এখন পেছনে পেছনে কিকিকে উড়ে আসতে দেখে খুশি হলো মিউ। সময় অসময়ে কিকি একটা আস্ত মানুষের কাজ করে দেয়।

বাঁদরটার সঙ্গে ওরা এসে দাঁড়ালো খাঁড়ির কাছটায়। একটা ভাঙা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সেখানে। জোয়ারের সময় জল ঢুকে তার অনেকটাই ডুবিয়ে দেয়। এখন ভাটা। জল অনেক নিচে। তাই সারা জায়গাটা কাদা কাদা। ইঁটের স্তূপগুলোয় শ্যাওলা ধরেছে। ওর ওপর পা দিলে হড়কে পড়ে যাবার ভয়। বাঁদরটা ইশারায় মিউকে ডেকে একটার পর একটা ইঁটের স্তূপ ডিঙিয়ে গেলো। কিকি ততক্ষণে মিউ-এর কাঁধের ওপর এসে বসেছে। মিউ খুব সাবধানে এগোতে লাগলো। খানিকটা যাবার পর বাঁদরটা একটা ইঁটের পাঁচিলের মতো জায়গায় গিয়ে থামলো। মিউ সেখানে যেতেই দেখলো পাঁচিলটার পাশেই পাহাড়ের গুহার মতো ছোট্ট একটা ঘর। চারপাশটা খোলা। মাথায় ছাদও নেই। ওপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো একটা টানেলের মুখ।

বাঁদরটা চুপ করে বসে আছে। ওর কাছ থেকে মিউ শুনেছে ঐ টানেলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলে বাবুর দেখা মিলতে পারে। চারটে লোক বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে পুকুরের পাশ দিয়ে ভাঙা বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এই টানেল দিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়। এই পথটার কথা কিন্তু কেউ জানে না।

মিউ আর দেরি করলো না। কিকিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লো টানেলের মধ্যে। মধ্যেটা একটু অন্ধকার। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মিউ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিকি সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিউ-এর গতি তাই অত্যন্ত মন্থর।

কিকি হঠাৎ উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে বললো, আর এগিও না।

কিকি চাপা স্বরে বলেছিলো। কিন্তু বদ্ধ জায়গায় তার স্বর গমগম করে উঠলো। তখনি স্পষ্ট হয়ে উঠলো একটা আলোর রেখা। একটা গুণ্ডা টাইপের লোক বাইরে এসে দাঁড়াতেই কিকি গিয়ে তার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা আঃ বলে ঠেলে দেবার আগেই কিকি ঠোঁট দিয়ে তার মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। লোকটা মাটিতে বসে পড়েছিল। সেই ফাঁকে মিউ আঁকাবাঁকা টানেলটা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইরে চলে এলো।

বাইরে বাঁদরটা বসেছিল। মিউ আসতেই সে-ও মিউ-এর পেছনে পেছনে এগিয়ে চললো তাঁবুর দিকে। মিউ এখন একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত, বাবুদাদা রাজাদাদাকে ওখানেই কোথাও বন্দী করে রেখেছে দুষ্টু লোকগুলো। কিন্তু কি করে ওদের উদ্ধার করবে ভেবে পাচ্ছিল না মিউ। ভাবলো তাঁবুতে গিয়ে মোমা আর বুয়ার সঙ্গে আলোচনা করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তাঁবুর কাছে আসতেই বাঁদরটা একটা গাছের ডালে চড়ে বসলো। মিউ গিয়ে ঢুকলো তাঁবুর মধ্যে। কিকিও ততক্ষণে এসে গেছে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই মিউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সারা তাঁবু লণ্ডভণ্ড। মোমা, বুয়া কেউ নেই। ওদের নাম ধরে ক'বার ডাকলো মিউ। আশঙ্কায় ওর বুক কেঁপে উঠলো। মোমা আর বুয়াকেও কি ওরা ধরে নিয়ে গেছে? মিউ তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো। মোমা, বুয়ার নাম ধরে ডেকেও কোনো সাড়া পেলো না। হঠাৎ বাঁদরটা গাছের ডাল থেকে চিৎকার করে উঠলো। মিউ বুঝলো ঐ চিৎকারের অর্থ। সে ছুটে গিয়ে বড় গাছটার আড়ালে দাঁড়ালো। কিকি উড়ে গিয়ে বসেছে গাছের ডালে। একটু পরেই দুটো লোক এসে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলো। তাঁবুর মধ্যেও একবার উঁকি দিলো।

একটা লোক বললো, অন্য মেয়েটা কোথায় গেলো রে?

তাই তো! ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। সর্দার বলেছে, চারটে ছেলেমেয়েকে ফাট পাওয়া গেছে, ওটাকেও চাই। আজ রাত্তিরে জাহাজ আসবে, ওদের বাংলাদেশে চালান করে দিতে হবে।

লোকটার কথা শেষ হলো না। অন্য লোকটা বলে উঠলো, মেয়েটা গেলো কোথায় বলতো! চল নদীর ধারটা একবার দেখে আসি।

ওরা গাছটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো। মিউ-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। ওরা যে ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কাল রাত্তিরে চালান করে দেওয়া হবে সকলকে। যা করার তার আগেই করতে হবে। কিন্তু ও একা কি করবে? মিউ কিচ্ছু ভেবে পায় না।

বাঁদরটা ততোক্ষণে অন্য বাঁদরগুলোকে ডেকে এনেছে। মিউ গাছগাছালির আড়ালে লুকিয়ে আছে। ও বুঝতে পারছে লোকগুলো তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কতোক্ষণ পালিয়ে বেড়াতে পারবে

লোকটা সামনে আছড়ে পড়লো।

কে জানে! কিন্তু এখন ও কি করবে? বাবুদাদা, রাজাদাদা, মোমা আর বুয়াকে ওরা ধরে রেখেছে। কিভাবে ওদের উদ্ধার করবে? ও একা। সঙ্গে একজন কেউ থাকলেই লড়া যেতো। তাই বলে চুপ করে বসে থাকা চলবে না। সময়ও বেশি নেই। তারমধ্যেই একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু সেই একটা কিছু যে কি তা ভেবে পায় না মিউ। কমলদাকে যে কোনোভাবে খবর দেবে সে উপায়ও নেই।

কিকি উড়ে এসে বসলো মিউ-এর কাঁধে। মিউ কিকিকে বুঝিয়ে দিলো তাকে কি করতে হবে। কিকি উড়ে গেলো টানেলের দিকে। একটা বাঁদর এসে ইশারায় মিউকে ডাকলো। তার পেছন পেছন এগিয়ে গিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে মিউ দেখলো, লোক দুটো নদীর ধারে বসে বিড়ি টানছে।

হঠাৎ মিউ-এর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। ও ঠিক করলো যা করার বাঁদরগুলোকে দিয়েই করাতে হবে। চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। চান্স একটা নিতেই হবে। সবার আগে নদীর ধারে বসে থাকা লোক দুটোকে কব্জা করতে হবে। মিউ ঠিক করে ফেললো কি করবে। বাঁদরগুলো গাছের ডালে বসেছিলো। মিউ ইশারা করতেই একটা বড় বাঁদর এসে বসলো ওর পাশে। মিউ বুঝিয়ে দিলো ওদের কি করতে হবে। বাঁদরটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এক লাফে গাছে উঠে অন্য বাঁদরদের ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো। তারপরই দেখা গেলো বাঁদরগুলো নদীর ধারে লোক দুটোর কাছাকাছি গিয়ে নিজেদের মনে খেলতে শুরু করেছে। প্রথমটায় লোক দুটো ভয় পেয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন দেখলে বাঁদরগুলো ওদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেও না, নিজেদের মনে খেলা করছে তখন নিশ্চিন্তে বসে গল্প করতে লাগলো। দুটো বড় গোছের বাঁদর বসেছিল মিউ-এর পাশে। তাদের নিয়ে মিউ চলে গেল তাঁবুর মধ্যে। পা মোছার জন্যে পাপোশ করবে বলে কয়েকটা বড় বড় বস্তা এনেছিল। রান্না-তাঁবুর ঢোকার মুখে তার দু তিনটে মাটিতে বিছানো ছিলো। মিউ তার থেকে দুটো বস্তা তুলে নিয়ে বাঁদর দুটোর হাতে দিয়ে ওদের কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলো। তারপর বাঁদর দুটোকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো গাছটার পেছনে। বাঁদররা তখন নদীর ধারে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলছে। লোক দুটোও নিশ্চিন্তে বসে গল্প করছে। মিউ ইশারা করতেই বাঁদর দুটো বস্তা নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো লোকদুটোর দিকে। মিউ পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করে তৈরি হলো।

বাঁদররা ওদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। নিজেদের মনে খেলা করছে। ওদের দিকে আর নজর দেবার দরকার নেই। লোক দুটো তাই নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। খেয়ালও করেনি পেছন থেকে দুটো বাঁদর এগিয়ে আসছে। হঠাৎ বাঁদর দুটো লোক দুটোর পেছনে লাফিয়ে পড়েই ওদের মাথা দিয়ে বস্তা দুটো পরিয়ে দিলো। মিউ রেডি ছিলো। ওরা কিছু বোঝার আগে মিউ ছুটে গিয়ে দড়ি দিয়ে বস্তা দুটো টাইট করে বেঁধে দিলো। এতো অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে লোক দুটো বাধা দেবার ফুরসতই পেলো না। খেলা থামিয়ে বাঁদরগুলো এসে দাঁড়ালো বস্তা দুটোর কাছে। মিউ-এর নির্দেশ মতো তারা বস্তা দুটো নিয়ে মিউ-এর পেছনে পেছনে খাঁড়ির গুহাটায় হাজির হলো। গুহাটার এক কোণে বস্তা দুটো যখন রাখা হলো লোক দুটো তখন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

মিউ ভেবেছিলো ওখান থেকে লোক দুটো যতোই চেঁচাক কেউ শুনতে পাবে না। কিন্তু কাছেই টানেল। ওদের চিৎকার টানেলের মধ্যে দিয়ে যে দুষ্টু লোকগুলোর কানে যেতে পারে এ কথাটা মিউ-এর মাথায় আসেনি। ও তখন গোটা চারেক বাঁদর সঙ্গে নিয়ে টানেলের মধ্যে ঢোকার তাল করছে। ছেলেধরার দলে ঠিক কজন আছে ও জানে না। মাত্তর দুজনকে কব্জা করা গেছে।

বাকীদের সঙ্গে লড়ার আগে ও বাবুদাদা আর রাজাদাদাকে মুক্ত করতে চাইছে। সেই চিন্তা মাথায় নিয়েই ও টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

অন্ধকার টানেলের অপরিসর জায়গা দিয়ে খানিকটা যেতে না যেতেই ও বুঝলো লোক দুটোকে গুহায় রেখে কতো বড় ভুল করেছে। ওদের চিৎকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। টানেলের মধ্যে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। কিকি উড়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে চাপা স্বরে বললো, সাবধান একটা লোক আসছে।

তারপরই টর্চের আলোর ঝলক দেখা গেলো। মিউ বাঁদরগুলোকে নিয়ে একটা দেওয়ালের আড়ালে সরে দাঁড়ালো। মিউ-এর ভাগ্য ভালো, টানেলটা এখানেই বাঁক খেয়ে ঘুরে গেছে।

লোকটা ততোক্ষণে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তার বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে উদ্যত পিস্তল। এই দিকটায় লোকটা যে আগে আসেনি ওর চলা দেখে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো। লোকটা আরো এগিয়ে এসেছে। মিউ বাঁদরগুলোকে ইশারা করলো তৈরি থাকার জন্যে। কিকিও রেডি।

লোকটা মিউ-এর পাশ দিয়ে দু পা যেতে না যেতেই মিউ ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাত দিয়ে তার পা দুটো চেপে ধরে পেছন দিকে টান দিতেই লোকটা সামনে আছড়ে পড়লো। হাতের পিস্তল আর টর্চ ছিটকে পড়লো দূরে। লোকটার মুখ দিয়ে উঃ করে একটা শব্দ বেরিয়েছিলো শুধু, ততোক্ষণে চারটে বাঁদর গিয়ে চেপে ধরেছে তাকে। মিউ-এর কাছে একটা বড় ন্যাকড়া ছিলো সেটা তাড়াতাড়ি লোকটার মুখে গুঁজে দিয়ে তাকে চটপট বেঁধে ফেললো। তারপর তাকে টেনে উল্টো দিকের একটা গলি মতো জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেললো। তার তখন টুঁ শব্দ করার কিংবা নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। পিস্তলটা একটা কোণে ফেলে রেখে মিউ টর্চটা হাতে তুলে নিলো।

এবার খুঁজে বের করতে হবে বাবুদাদা আর রাজাদাদা কোথায় আছে। খুব সহজ নয় ব্যাপারটা। এ তো সিংহের ডেরায় ঢুকে শাবক খোঁজার মতো। মিউ-এর নির্দেশে কিকি উড়ে গেলো ওদের খুঁজে বের করতে। বাঁদর চারটেকে সঙ্গে নিয়ে মিউ খুব সাবধানে পা পা করে এগোতে লাগলো। এতো দূরে সে সকালে আসেনি। টানেলটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানটায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরই সার সার কটা ঘর। মিউ বুঝলো, এখানেই এক সময় বড় বাড়িটা ছিলো। তারই একটা অংশ কোনো কারণে মাটির তলায় বসে গেছে। বসে গেলেও ঘরগুলো মোটামুটি ঠিক আছে। এমনও হতে পারে এগুলো বড় বাড়িটার মাটির তলার ঘর। গুম ঘরও হতে পারে। আগেকার দিনে ডাকাতের চোখে ধুলো দেবার জন্যে মাটির তলায় ঘর বানানো হতো। বাড়িতে ডাকাত পড়লে সোনা-দানা, জিনিস-পত্তর নিয়ে সকলে মাটির তলায় ঐ সব ঘরে লুকিয়ে থাকতো। টাকীতে ঘোষবাবুদের বাড়িতেও ঐ রকম পাতালঘর আছে। পুজোর দালানের সামনের চকটার নিচেই পাতালঘর। কেউ কেউ গুমঘরও বলে। অবাধ্য প্রজাদের ধরে এনে নাকি ওখানে গুম করে দেওয়া হতো।

ও সব নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। লোকটার দেরি দেখে যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ তার খোঁজে বেরুতে পারে। তাহলে আর দেখতে হবে না। মিউ একেবারে সামনা-সামনি পড়ে যাবে। সবে তিনজনকে মিউ তার বাঁদর বাহিনীর সাহায্যে কব্জা করেছে। এখনো কতোজন আছে কে জানে!

হঠাৎ কিকি উড়ে এসে ও পাশে একটা ঘরের দিকে ইশারা করলো। মিউ বুঝলো ঐ ঘরে বাবুদাদা কিংবা রাজাদাদা অথবা দুজনেই আছে। পা টিপে টিপে মিউ গিয়ে ঘরটার সামনে দাঁড়ালো। ভেবেছিল, ঘরটা ও খুলতে পারবে। কিন্তু সামনে গিয়ে নিরাশ হলো। মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। অন্য সময় হলে তালাটা ভাঙতে চেষ্টা করতো। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তালা ভাঙতে গেলে শব্দ হবে। কি করবে তাই ভাবছে এমন সময় একটা বাঁদর মিউ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ওপরের একটা ফাঁকা জায়গার দিকে। আগে নির্ঘাৎ ঘরে আলো ঢোকার জন্যে স্কাইলাইট ছিলো। এখন সেখানটায় ফাঁকা।

বাঁদরটা এক লাফে সেখানে উঠে পড়ে নেমে পড়লো ঘরের মধ্যে। তার পেছনে উড়ে গেল কিকি। মিউ বাকি তিনটে বাঁদরকে এপাশ ওপাশ থেকে সব খবর আনার জন্যে পাঠিয়ে দিলো। ছেলেধরার দলে এখনো কতোজন আছে সেটা জানাই ওর উদ্দেশ্য। তাছাড়া মোমা আর বুয়াকে ওরা কোথায় রেখেছে সেটাও জানা দরকার।

জায়গাটায় খুব যে একটা আলো আছে তা নয়। ঠিক সন্ধ্যের মুখে যে রকম হয় অনেকটা সেই রকম। তাই চারদিকটা দেখতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। হাতের টর্চটাও জ্বালতে হচ্ছে না।

মিউ খেয়াল করেনি, একটা ঘরের দরজা খোলা ছিলো। মিউ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা লোক বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। মিউকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো, গুরু, এখানে একটা মেয়ে....

সে কী? মেয়ে দুটোকে ভালো করে বেঁধে রাখিসনি?

রেখেছি তো!

তাহলে?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ষণ্ডামার্কা একটা লোক। তার হাতে উদ্যত রিভলবার.....

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

সারমেয়

রাধাকিশোর গোস্বামী

সেই কোন প্রাচীনকালে পনি নামে একদল অসুর দেবতাদের গরু চরাত। গরুগুলোকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য ঘুরে ঘুরে নানাস্থানে নিয়ে যেত। প্রত্যেকটা গরুই অনেক অনেক দুধ দিত। যেমন ক্ষীরের মতো ঘন দুধ, তেমনি তার সুগন্ধ। দেখে দেখে অসুরগুলোর খুব লোভ হলো। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করল গরুগুলোকে চুরি করবে। একদিন চরাতে বেরিয়ে তারা গোপনে চুপি চুপি গরু নিয়ে রসা নদী পেরিয়ে নিজেদের রাজ্যে চলে গেল। সেখানে একটা পাহাড়ের গুহায় গরুগুলোকে আটকে রেখে খুব মজা করে গাঢ় দুধ, ক্ষীর, সর, মাখন, দৈ খেতে থাকল সবাই মিলে। একজনও আর দেবতাদের কাছে ফিরে গেল না।

গরু চুরির ব্যাপারটা জানতে পেরে দেবতারা ভয়ানক রেগে সুপর্ণকে ডেকে পাঠালেন। এই সুপর্ণ হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ভাল নাম।

সুপর্ণ এলে দেবতারা বললেন, 'বৎস সুপর্ণ, তুমি তো অনায়াসে বাতাসের চেয়ে তীব্রগতিতে সর্বত্র যাতায়াত করতে পার। তুমি গরুগুলোকে খুঁজে ফিরিয়ে আন।'

দেবতাদের নির্দেশ পেয়ে সুপর্ণ আকাশপথে রওনা হয়ে গেল গরুর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে শেষে রসা নদীর অপর পারে পৌঁছল ঠিক যেখানে অসুরেরা গরুগুলোকে আটকে রেখেছিল। সুপর্ণ দেখল গরুগুলো এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। আর অসুরেরা তাদের চারদিকে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে।

সুপর্ণকে তাদের দিকে আসতে দেখে অসুররা সহজেই বুঝতে পারল, দেবতারা তাকে পাঠিয়েছে গরু খুঁজতে। এখন সুপর্ণ যদি ফিরে গিয়ে দেবতাদের জানায় গরুগুলো কোথায় আছে তাহলেই সর্বনাশ। দেবতারা এসে তাদের মেরেধরে গরুগুলোকে নিয়ে যাবেন। তারা মতলব করল যেমন করেই হোক সুপর্ণকে দলে টানতেই হবে। তাকে দেখে যেন অসুরদের কতো আনন্দ হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে এগিয়ে গিয়ে তারা সুপর্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল— 'ভাই সুপর্ণ! তোমার মঙ্গল হোক। বহুদূর থেকে আসছ তুমি। আগে বিশ্রাম কর। তারপর কথা হবে।'

এই বলে তারা সুপর্ণর সামনে থরে থরে দুধ, ক্ষীর, মাখন, দই সাজিয়ে দিল। পরম আদরের সঙ্গে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে তৃপ্তি করে খাও।'

অত ভালো ভালো খাবার দেখে সুপর্ণও লোভ সামলাতে পারল না। অসুরদের আতিথ্য স্বীকার করে পেটভরে দুধ, ক্ষীর, মাখন খেল। চলে যাবার সময় অসুরগুলো তাকে বলল, 'ভাই, আমাদের আতিথ্যে তুমি নিশ্চয় খুবই প্রসন্ন হয়েছ। আমাদের উপহারও সানন্দে গ্রহণ করেছ। এর পর যখনই ইচ্ছে হবে আমাদের কাছে চলে এসে পেটভরে দুধ, ক্ষীর, সর, মাখন প্রভৃতি খেয়ে

যেও। আর ভাই, আমাদের কথা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে দয়া করে যেন বলে দিও না।'

'তাই হবে।' সুপর্ণ চলে গেল।

দেবতাদের কাছে সুপর্ণ ফিরে এলে দেবতারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের গরুগুলো কোথায়? তাদের কোনো খোঁজ পেলে কি?'

সুপর্ণ অতি সহজভাবে উত্তর দিল, 'আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পেলাম না।'

তার হাবভাব দেখে দেবতাদের সন্দেহ হলো, সে সত্য কথা বলছে না। ইন্দ্র তখনই ধ্যানযোগে তার মনের কথা আর কি কি ঘটেছিল সবকিছুই জানতে পারলেন। তখন রেগে গিয়ে সুপর্ণকে তিরস্কার করে ইন্দ্র বললেন, 'নীচ! মিথ্যাবাদী! বিশ্বাসঘাতক! তোকে সারাজীবন দুঃখভোগ করতে হবে। দূর হয়ে যা সামনে থেকে।'

সুপর্ণ পালিয়ে বাঁচল।

এই ঘটনার পর দেবতারা তাঁদের পরম বিশ্বাসের পাত্রী স্ত্রী-কুকুর সরমাকে ডেকে পাঠালেন। সরমা এলে তাকে দেবতারা বললেন, 'বৎসে, তুমি আমাদের অকপট ভক্তিশ্রদ্ধা করো। তোমার মতো এমন বিশ্বাসভাজনও আর কেউ নেই। আমাদের গরুগুলোকে তুমি খুঁজে বের করো। তোমার তীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তুমি সহজেই এ কাজ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

এর পর খোঁজ করতে করতে সরমা ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হলো। সরমাকে আসতে দেখে অসুররা ভাবল একেও সুপর্ণর মতো তাদের দলে টেনে নেবে। তাই সরমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'এস বোন, এস। তারপর শরীর গতিক ভালো তো? এসেছ যখন তখন আমাদের দেশের দুধ, মাখন, ক্ষীর, সর পেটভরে খাও। পরমানন্দে আমাদের এখানে থাক, খাও-দাও, আর ঘুরে বেড়াও।'

কিন্তু সরমা সুপর্ণ নয়। সে অসুরদের সাদর অভ্যর্থনা আর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'আমাকে লোভ দেখিও না। গরুগুলোকে আমি নিতে এসেছি, ওগুলো নিয়েই আমি যাব। যদি না দাও, তবে ইন্দ্র তোমাদের সবাইকে মেরে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

সরমার কথায় অসুররা অবজ্ঞাভরে হেসে উঠল। উদ্ধতভাবে বলল, 'আমরা এত বোকা নই যে বিনা যুদ্ধে এমন সব সুন্দর দুগ্ধবতী গরুগুলোকে ফেরত দেব। তাছাড়া আমাদের এমন সব ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র আছে যার সামনে দেবতারাও দাঁড়াতে পারবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পার। যুদ্ধ ছাড়া আমরা কিছুতেই গরুগুলোকে ফেরত দেব না।'

সরমা আবার তাদের বলল, 'দেখ তোমাদের ভালো কথা বলছি। এদের ফেরত দাও, নইলে দেবতারা তোমাদের মেরে এদের নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে। আর তোমাদের এই হঠকারিতা তোমাদের সকলের ধ্বংসের কারণ হবে।'

অসুররা তবুও সরমার কথা কানে তুলল না। অগত্যা সরমা দেবতাদের কাছে ফিরে গেল।

সরমা ফিরতেই দেবতারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎসে, তুমি কি আমাদের গরুগুলোর কোনো খোঁজখবর পেয়েছ?'

উত্তরে সরমা তখন অসুরদের সব কথা বিস্তৃতভাবে দেবতাদের জানিয়ে দিল। শুনে প্রসন্ন হয়ে দেবতারা বললেন, 'বৎসে, তোমার মঙ্গল হোক। আমরা আশীর্বাদ করছি আজ থেকে সারা পৃথিবীতে তোমার বংশধরেরা 'সারমেয়' নামে পরিচিত হবে। যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন পরম বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ প্রভুভক্তির নিদর্শন রূপে তোমার নামও অমর হয়ে থাকবে।'

এর পর সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বেরোলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে সব অসুরদের মেরে ফেলে গরুগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন স্বর্গরাজ্যে।

সেই সরমা আজ আর নেই। কিন্তু দেবতাদের আশীর্বাদে সরমার বংশধরেরা সারমেয় নামে পৃথিবীর সকলের কাছে পরম বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির আদর্শ হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছে। আর ভবিষ্যতেও থাকবে।

ছবি: সরোজ সরকার

HOLY FAITH INTERNATIONAL (P) LTD.
Gulab Bhawan, 6 Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi-110 002
Phones: 3317931, 3318301

Colourful Children's Books,
Intelligently Planned,
Beautifully
Designed and
well presented.

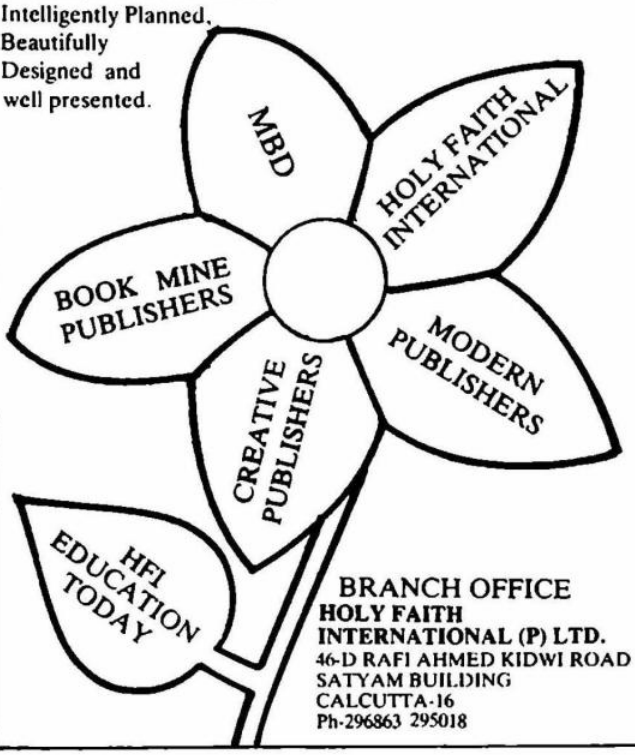

BRANCH OFFICE
HOLY FAITH
INTERNATIONAL (P) LTD.
46-D RAFI AHMED KIDWI ROAD
SATYAM BUILDING
CALCUTTA-16
Ph-296863 295018

চাপেকার ভাইদের ফাঁসি

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

এক আশ্চর্য কিশোরের কাহিনী। এমনই এক কিশোর যার রক্তে ছিল আগুনের দাপাদাপি। যে মৃত্যুকে মুঠোয় ভরে গর্জে উঠতে চেয়েছিল ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। যে ফাঁসির আদেশ শোনার পর বিচারককে বলেছিল, 'ধর্মাবতার, আমাকে দুবার ফাঁসি দেবার আদেশ দিন। নইলে আমি যে বুঝতে পারব না কাকে খুন করার জন্য আমার ফাঁসি হচ্ছে। কারণ আমি যে দুজনকে খুন করেছি—'

সেই কিশোরের কাহিনী বলতে গেলে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। প্রয়োজন আরো কয়েকজনের কাহিনী জানা। যারা মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে মাতৃজাতির অবমাননার শোধ নিতে এগিয়ে গিয়েছিল দুঃশাসনরূপী ইংরেজ নিধনে। ফাঁসির আদেশ শুনে ফেটে পড়েছিল হাসিতে। খুশি মনে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল ফাঁসি-মঞ্চের দিকে।

তখন উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত। বোম্বাই ও পুনায় প্লেগ নামক ব্যাধিটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। মানুষ মরছে তো মরছেই।

ওই প্লেগের আক্রমণ থেকে বিশেষ করে ইংরেজ সাহেবরা যাতে রক্ষা পায় তার জন্য সেখানে পাঠানো হলো কুখ্যাত শাসক র‍্যান্ডকে। তাকে পাঠানো হলো প্লেগ কমিশনার করে।

র‍্যান্ড সেখানে পৌঁছেই জানিয়ে দিল যদি কোনো কালা আদমিদের পল্লীতে প্লেগ দেখা দেয় তবে সেই পল্লীর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। কারণ ওই ব্যাধিটির জন্য নাকি কালা আদমিরাই দায়ী।

তার নির্দেশ মতো ফিরিঙ্গী সেপাইরা জ্বালিয়ে দিতে লাগল ঘরবাড়ি। পরীক্ষা করার নামে নিরীহ নরনারীর উপর শুরু হলো অকথ্য অত্যাচার।

বিদেশী শাসকদের এই অত্যাচারে মহারাষ্ট্রের কিছু তরুণের বুকে ঝড় উঠল। মা-বোনেদের অসম্মানে ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহায় জ্বলে উঠল তারা।

তাদের সেই ক্রোধের আগুনকে আরো বেশি করে প্রজ্জ্বলিত করলেন তিলক মহারাজ, অর্থাৎ বালগঙ্গাধর তিলক। সেখানকার 'কেশরী' পত্রিকায় তাঁর অগ্নিবর্ষণকারী লেখাগুলো পাঠ করে উজ্জীবিত হয়ে উঠল সেই তরুণরা।

কমিশনার র‍্যান্ড ও তার সহকারী আয়ার্স্টের নিধন যজ্ঞে অংশ নিতে এগিয়ে এলো বোম্বাইয়ের ছেলে দামোদর চাপেকার, বালকৃষ্ণ চাপেকার, বাসুদেব চাপেকার নামে তিন ভাই আর তাদের সঙ্গে যোগ দিল বালকৃষ্ণ-বাসুদেবের অত্যন্ত কাছের মানুষ, বন্ধু রানাডে।

ওরা ওদের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল পুনায়। তখন পুনাতে প্লেগ বেড়ে যাওয়ায় সেখানেই অবস্থান করছে কমিশনার র‍্যান্ড। সেখানে বস্তিতে বস্তিতে চলছে অকথ্য অত্যাচার।

ওরা এসে উঠল লৈখদিপুলের এক বস্তিতে। এখানেই প্রাচীন

লক্ষ্মীমন্দির। সেই মন্দিরের পুরোহিত প্লেগ আর র‍্যান্ড সাহেবের ভয়ে আগেই পালিয়েছে। তাই বন্ধ হয়ে রয়েছে পূজা। দামোদর ব্রাহ্মণ। একটু চেষ্টাতেই সে পেয়ে গেল পুরোহিতের কাজটি। অবশ্য পুরোহিতের কাজই তার উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য মন্দিরের কাছে যে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ছাউনি রয়েছে তারই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অস্ত্র যোগাড় করা।

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগল না। যোগাড় হলো দুটি রাইফেল, দুটি রিভলবার ও কার্তুজ। সেগুলো রেখে দেওয়া হলো লক্ষ্মীমাঈর আসনের আড়ালে। আর সেগুলো পাহারার দায়িত্ব পড়ল বাসুদেবের ওপর। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর রানাডের কাজ হলো র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা। নজর রাখা তাদের গার্ডদের ওপর। যাতে ওদের প্রথম চেষ্টাই সফল হয়।

দিন যায়, মাস যায়। মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে ওঠে ওরা। ভাবে আর দেরি করা ঠিক নয়। কিন্তু একটা চিন্তা তাদের ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে, যদি প্রথম চেষ্টা বিফল হয়? যদি দ্বিতীয়বার সুযোগ না মেলে?

এক দুই করে তিন মাস কেটে গেল। এলো ১৮৯৭ সালের ২২ জুন। ইংলন্ডেশ্বরী তথা ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের রাত্রি। ওই রাতটিকেই র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের জীবনের শেষ রাত হিসাবে বেছে নিল ওরা।

সরকারী আদেশে সারা শহর যেন উৎসবের সাজে সেজেছে সেদিন। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। জামসেদজীর বাড়ির কাছে কিছু গাছপালা। তারই অন্ধকার আড়ালে লুকিয়ে দামোদর, বাসুদেব আর রানাডে। কিছু দূরে লুকিয়ে বালকৃষ্ণ।

তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এলো দুটি সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি। একটিতে সস্ত্রীক র‍্যান্ড, অপরটিতে সস্ত্রীক আয়ার্স্ট। গাড়ি দুটি ছুটছে বেশ কিছুটা ব্যবধানে।

জামসেদজীর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বালকৃষ্ণের সঙ্কেত ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে তীব্র বেগে ছুটে গেল দামোদর। লাফিয়ে উঠল র‍্যান্ডের গাড়ির পেছনে। একটা প্রচণ্ড ঘুঁষিতে ছিটকে ফেলে দিল সহিসকে। তারপর গাড়ির পেছনের ফোকরটা দিয়ে বাড়িয়ে দিল রিভলবারটা। মুহূর্তে রিভলবারের নলটা স্পর্শ করল র‍্যান্ডের মাথাটা। ট্রিগার টিপল দামোদর। কিছু বুঝবার আগেই গাড়ির মধ্যে লুটিয়ে পড়ল র‍্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো তার।

সামনের গাড়িতে গুলির শব্দ শুনে পেছনের গাড়িতে বসা আয়ার্স্ট জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বুঝতে চাইল ব্যাপারটা। কিন্তু তার কিছু বোঝা হলো না। ছুটন্ত গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে গিয়ে রিভলবারের ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিল রানাডে। ঢলে পড়ল আয়ার্স্ট। কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর মারা গেল সে।

ওই ঘটনার দেড়মাস বাদে হঠাৎই সন্দেহবশে পুলিশ গ্রেপ্তার করল দামোদরকে। দামোদর দ্বিধাহীন নির্ভীক কণ্ঠে পুলিশকে জানাল যে সে-ই অত্যাচারী র‍্যান্ডের হত্যাকারী। কিন্তু পুলিশের অকথ্য নির্যাতনেও আয়ার্স্টের হত্যাকারীর নাম বলল না সে।

দামোদরকে ধরতে পারলেও তার দুই ভাইকে ধরতে পারল না পুলিশ। ধরতে পারল না রানাডেকেও। বালকৃষ্ণকে ধরে দিতে পারলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল সরকার। বয়সে তরুণ বলেই হয়তো বাসুদেবের নামে পুরস্কার ঘোষণা করা হলো না, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বালকৃষ্ণ ধরা পড়ল হায়দ্রাবাদে। ঠিক ধরা পড়ল বললে ভুল হবে, ধরিয়ে দিল এই দেশেরই মানুষ। কিন্তু সেই মিরজাফরটি কে বা কারা জানতে পারল না কেউ।

পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সংবাদপত্রের পাতায় একটা আশ্চর্য চিঠি নজরে পড়ল বাসুদেবের। চিঠিটা লিখেছে গণেশশঙ্কর দ্রাভিড্ নামে জনৈক ব্যক্তি। বালকৃষ্ণকে ধরিয়ে দিতে পারলে যে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তার অর্ধেক মাত্র পেয়েছে সে আর তার ভাই। যাতে আর অর্ধেক টাকা তারা

চিতার থাবা

মঞ্জিল সেন

মধ্যপ্রদেশের এক গোলাবারুদের কারখানায় প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গোলার কার্তুজ তৈরির কাজ চলছিল। সেটার প্ল্যানিং-এর ভার ছিল মিঃ বোসের ওপর। ঐ কার্তুজের ড্রইংয়ের নকল চেয়ে তাঁর কাছে উড়ো চিঠি এল। রাজী হলে মোটা টাকা পাবেন, নচেৎ ভীষণ বিপদ হবে। চিঠির নিচে স্বাক্ষর ছিল 'চিতা' আর থাবার একটা ছাপ। এদিকে কাছের জঙ্গল থেকে একটা চিতাও হানা দিতে শুরু করেছে। চিতার সঙ্গে এই শাসানো চিঠির কি সম্পর্ক! মিঃ বোসের ভাগ্নে প্রশান্ত, তের বছরের মেয়ে কাজল সবাই জড়িয়ে পড়ল এক ভীষণ চক্রান্তের সঙ্গে। হ্যাঁ, একটা কালো চিতাও দেখা দিল– হিংস্র, ক্ষুধার্ত চিতা। আর আছে দৈত্যের মতো এক বামন, যাকে সেই চিতাও ভয় করে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ার মতো দুর্ধর্ষ, রোমাঞ্চকর কাহিনী।

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ

পেতে পারে সেজন্য ওই পত্র মারফৎ ইংরেজ সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে গণেশশঙ্কর।

ওই চিঠিটা পড়ার পর একাই ওদের ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল বাসুদেব। কারণ ওই দুই মিরজাফরকে চরম শাস্তি না দিতে পারলে যে স্বস্তি নেই তার। ওরাই যে খুনের মামলায় সাক্ষী দেবে।

বেশি সন্ধান করতে হলো না। সে জানতে পারল ওরা পুনারই দুই নামকরা গুণ্ডা—গণেশ আর রামচন্দ্র দ্রাভিড্।

কয়েকদিন ওদের চলাফেরার ওপর লক্ষ্য রাখল বাসুদেব। লক্ষ্য করল ওদের সঙ্গে থানার পুলিশ সাহেব এমন কি তাদের বড় কর্তাদেরও বেশ দহরম মহরম। এই সুযোগই কাজে লাগাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে।

একদিন সন্ধ্যার পর এস. পি. সাহেবের আর্দালি সেজে বাসুদেব গিয়ে উপস্থিত হলো গণেশ-রামচন্দ্রের ডেরায়। যখন সেখানে পৌঁছলো সে তখন তার দেহে টগবগ করে ফুটছে প্রতিহিংসার আগুন। কল্পনায় সে যেন দেখতে পাচ্ছে মেজদা বালকৃষ্ণের ফাঁসিতে ঝুলন্ত শরীরটা। হ্যাঁ, ওই দুই মিরজাফরের জন্যই তো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তার মেজদাকে। অতএব—

মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই গণেশ-রামচন্দ্রের। আর এই মৃত্যুই যেন সাবধান করে দেয় আগামী দিনের সেই মানুষগুলোকে, যাদের মাতৃজাতির বা মাতৃভূমির ওপর মমতা নেই, যারা শুধু অর্থকেই চেনে। চেনে নিজের সুখটুকুকে।

টক্-টক্-টক্। দরজায় শব্দ করল বাসুদেব। খুলে গেল দরজা। রামচন্দ্র আর গণেশকে ডেকে পাঠিয়েছেন এস. পি. সাহেব। জানাল বাসুদেব।

'কেন?' প্রশ্ন করল গণেশ।

বাসুদেব বলল, 'কী ভাবে সাক্ষ্য দিতে হবে মামলায় সেটাই আজ বলে দেবেন সাহেব।'

'রামচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে আসছি।' বলল গণেশ। ঢুকে গেল ঘরে।

এরপর জ্বালাধরা বুকে রিভলবার হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাসুদেবের মনে হতে লাগল প্রতিটি মুহূর্ত যেন অনেকগুলো ঘণ্টার সমষ্টি।

পরিষ্কার পোশাক পরে দরজার বাইরে পা রাখল রামচন্দ্র আর গণেশ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গুলি বিদ্ধ করল ওদের বুক দুটো। আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল দুই ভাই—দুই মিরজাফর।

ওদের মৃত্যুর কিছুদিন পরই ধরা পড়ল বাসুদেব আর রানাডে।

ধরা পড়ে পুলিশের অসহনীয় নির্যাতনেও উৎফুল্ল বাসুদেব। কারণ সে যে কাজের মতো কাজ করেছে। ভবিষ্যতে যাদের মিরজাফর হবার সাধ হবে তারা নিশ্চয়ই এই দুই ভাইয়ের পরিণতির কথা স্মরণ করে দ্বিধাগ্রস্ত হবে, নিরস্ত হবে। আদালতে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে সেই কথাই বলল সে। বিচারককে অনুরোধ করল তাকে দুবার ফাঁসির আদেশ দিতে।

বাসুদেবের কথা শুনে স্তম্ভিত হলো আদালতে উপস্থিত মানুষজন। ফাঁসির আদেশ শোনার পর কোনো তরুণ যে এমন কথা বলতে পারে এ যে তাদের কল্পনারও বাইরে।

পর পর ফাঁসির দিন ধার্য হয়েছে। প্রথমে ফাঁসি হবে দামোদরের, ১৮ এপ্রিল ১৮৯৯। এরপর বাসুদেবের, ৮ মে ১৮৯৯। তারপর রানাডের ১০ মে ১৮৯৯। সবশেষে বালকৃষ্ণের ১২ মে ১৮৯৯।

দামোদরের ফাঁসি হয়ে গেল। এগিয়ে এলো বাসুদেবের ফাঁসির দিন। ফাঁসি-মঞ্চের পথের পাশে বালকৃষ্ণের সেল। নিঃসঙ্গ বন্দী বালকৃষ্ণ সারারাত ঘুমোতে পারেনি। তার আগেই চলে যাচ্ছে ছোট ভাই বাসুদেব। এ যে অসহ্য! তার ফাঁসিটা আগে হলে দারুণ খুশি হতো সে।

ফাঁসি মঞ্চের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বাসুদেব। বালকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলল, 'মেজদা, আমি আজ বড়দার কাছে চললাম।'

বাসুদেবের উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেল বালকৃষ্ণ। সেও চিৎকার করে বলল, 'যারে বাসুদেব। বড়দাকে বলিস তিনদিন পর আমিও আসছি।'

বাসুদেব বলল, 'ঠিক আছে মেজদা। বলব।'

সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা দেখল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাসুদেবের মুখ। মৃত্যুভয়ের চিহ্নমাত্র নেই সেই মুখে। কেনই বা থাকবে? সে যে জানে জীবনে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সেই মৃত্যু যদি গৌরবের হয়? মাতৃভূমির জন্য, মাতৃজাতির জন্য, মিরজাফরদের শাস্তিদানের জন্য মৃত্যু তো গৌরবেরই। তাই ফাঁসিমঞ্চের দিকে যেতে একটুকুও পা কাঁপল না বাসুদেবের। হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে সেদিন মৃত্যুকেই ভয় পাইয়ে দিল সে।

এক মায়ের তিন সন্তানের আত্মদানের কাহিনী, রানাডের কাহিনী আজও মহারাষ্ট্রবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। ভারতবাসী কখনো এই শহীদদের বিস্মৃত হবে না।

ছবি: সরোজ সরকার

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

দেখো দেখি সময় কেমন কেটে যায়। দেখতে দেখতে শ্রাবণ মাস এসে গেলো। এখন তো পুরো বর্ষা। কালো মেঘগুলো আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। কখনো ঝমঝম কখনো টিপটিপ করে বৃষ্টি। বিদ্যুতের চমক আকাশটাকে কেটে যেন ফালাফালা করে দিচ্ছে। বাজের শব্দে কানে তালা ধরে যায়। ভেসে আসে ব্যাঙের ডাক। ওদিকে চাষীভাইরা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। আজকাল অবশ্য সারা বছর ধরেই ধানের চাষ হয়। তবে এই সময়টাই কিন্তু আসল। এখন আর পাতাল থেকে জল তুলে চাষ করতে হয় না। প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার উজাড় করে জল দেন আমাদের জন্যে। প্রকৃতির সব কিছুই তো চলে নিয়ম মেনে। নিয়ম ভাঙি শুধু আমরাই—মানুষরা। বন কেটে বসত গড়ে, শহর জুড়ে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করে আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। তাই তো প্রকৃতিও আজকাল খামখেয়ালি আচরণ করছে। কোথাও আচমকা ঝড় হয়ে বাড়ি-ঘরদোর উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও হঠাৎ ভূমিকম্প হচ্ছে, জেগে উঠছে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি। এসব কিন্তু প্রকৃতির সাবধানবাণী। আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে প্রকৃতি। আমরা যদি সংযত না হই, ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাই তাহলে বড় বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। তাই তো তোমাদের বলি যে যতো পারো গাছ লাগাও। সেই গাছ বাঁচিয়ে রাখো। কেউ বড় গাছ কাটতে চাইলে প্রতিবাদ জানাবে। মনে রেখো, গাছই আমাদের সব থেকে বড় বন্ধু। অবশ্য তোমরা যে গাছ লাগাচ্ছো, তোমাদের গাছে ফুল-ফল ধরছে এ খবর তো তোমরা আমায় নিয়মিত দাও। আমি জানি শুকতারার বন্ধুরা এই ব্যাপারে শুধু সতর্কই নয়, অত্যন্ত তৎপরও। থাক ওসব কথা। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি।

আজ আমাদের কারো মন ভালো নেই জানো। তোমাদেরও মন খারাপ হয়ে যাবে। তোমাদের সকলের প্রিয় লেখক, আমাদের বড় দাদা এবং শুকতারার একনিষ্ঠ কর্মী শিশিরকুমার মজুমদার গত ৩০ মে দুপুরবেলায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। গত ১৫ এপ্রিল সকালবেলায় শুকতারার পুজো সংখ্যার লেখার জন্যে একজন লেখকের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে স্নান করে খেতে বসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রায় এক মাস নার্সিংহোমে থাকার পর তাঁকে এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে নিভে যায় জীবনদীপ।

শিশিরকুমার মজুমদার কতোবড় লেখক ছিলেন সে কথা মনে হয় তোমাদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। ওঁর গল্প-উপন্যাস তোমরা তো অনেক অনেক পড়েছ। শুধু তাই নয়, চরণ দাস ছদ্মনামে তিনি তোমাদের প্রায় প্রত্যেক মাসেই শোনাতেন অগ্নিযুগের সৈনিকদের কথা। ছোটদের লেখকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই সামনের সারিতে আছেন, শিশিরকুমার মজুমদার ছিলেন তাঁদেরই একজন। শিশু সাহিত্যের জন্যে তিনি দিল্লি থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার, পেয়েছেন মৌচাক পুরস্কার, শিশু সাহিত্য পরিষদ থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাঁকে পুরস্কৃত করে সম্মান জানিয়েছে।

এবারও শুকতারার পুজো সংখ্যার জন্যে দারুণ একটা উপন্যাস দিয়ে গেছেন। ওঁর লেখার বিষয়বৈচিত্র্য প্রত্যেকবারই তোমাদের অবাক করে দেয়। এবারও দেবে। এবারের উপন্যাসটির পটভূমি এমন সুন্দর যে পড়ার সময় অজান্তেই তোমরা পৌঁছে যাবে এমন একটা দেশে যার অস্তিত্বর কথা আমরা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। উপন্যাসটি পড়লেই বুঝতে পারবে শিশিরকুমার মজুমদার কতো বড় লেখক ছিলেন। কিন্তু সেই মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই। অমন ভালো এবং উদার মনের মানুষ এ যুগে আর জন্মাবেন না। নিজের বলে কিছুই রাখতেন না, সব দিয়ে থুয়ে মুক্ত হস্তে ঘুরে বেড়াতেন। লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ছাড়া আর একটি মাত্র মানুষের কথাই সত্যজিৎ রায় শুনতেন, গুরুত্ব দিতেন—তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের শিশিরদা। এসো আমরা সকলে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

বাঘ শিকার

ঘটনাটা আমার ঠাকুমার মুখে শোনা।

অনেক দিন আগের কথা। কম করে ষাট বছর তো হবেই।

তখন আমাদের গ্রামের আশপাশে ছিল প্রচুর জঙ্গল। তাতে আবার বাঘও থাকত। একদিন একটা বাঘ গ্রামের এক বাড়ি থেকে একটা গরু নিয়ে গেল। এই রকম করে প্রত্যেক দিন চলতে লাগল। তখন গ্রামের লোকেরা সভা করে ঠিক করতে বসল যে তারা কেমন করে বাঘ মারবে। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপায় বার হয় না। তখন একটা ডানপিঠে ছেলে বলল, আমি কয়েক দিন সময় চাইছি তার মধ্যে আমি যেমন করেই হোক বাঘ মারব। গ্রামের লোকেরা অবাক হলেও রাজী হলো।

ছেলেটা আরও কিছু ছেলের সঙ্গে গ্রামে বেরুল চাঁদা চাইতে। তার দুদিন পরে সেই চাঁদার টাকা দিয়ে সে কিনল প্রচুর আঠা। আঠা এনে অনেক অনেক গাছের পাতা যোগাড় করে প্রত্যেক পাতায় সে আঠা লাগিয়ে দিল। তারপর বাঘ যে রাস্তা দিয়ে সাধারণত আসে সেই রাস্তায় পাতাগুলো পেতে রাখল।

সেই দিন রাত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড বাঘের ডাক শোনা গেল। অমনি সেই ছেলেটা তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সেই রাস্তার ধারে গেল। তারা দেখল বাঘের সারা গা আঠা লাগানো পাতায় মাখানো। আসলে বাঘের পা প্রথমে আঠা লাগানো পাতায় আটকে যায়। সেই পা ছাড়াতে গিয়ে তার সারা শরীরে আঠা লাগানো পাতা লেগে যায়। পা না ছাড়াতে পেরে সে পালাতেও পারছে না। তখন সবাই মিলে পিটিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলল। তার পরে আনন্দে সেই ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সকলে বাড়ি ফিরল।

দেবাঞ্জন তরফদার,
বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী, ধর্মদা কে কে হাই স্কুল, নদীয়া

অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বাস,
বয়স ষোলো, একাদশ শ্রেণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

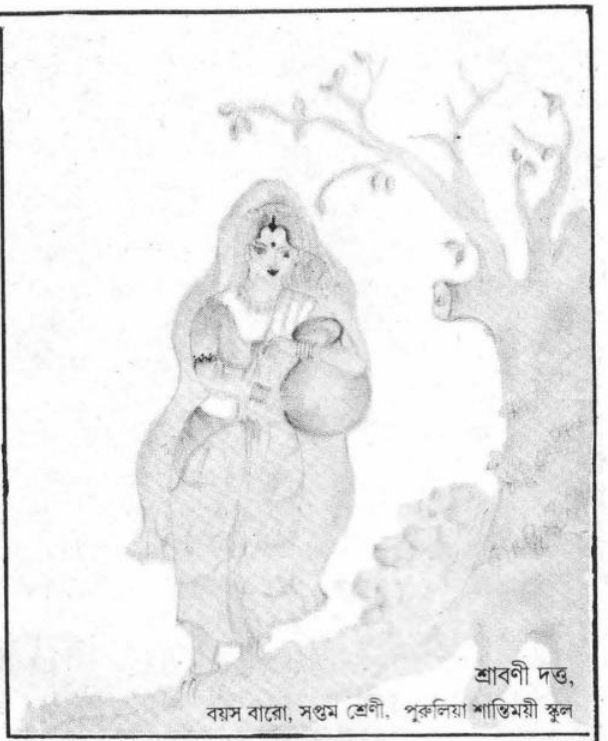

শ্রাবণী দত্ত,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, পুরুলিয়া শান্তিময়ী স্কুল

পদ্য লেখা

পদ্য লেখা, গদ্য গড়া
বড়ই শক্ত কাজ,
জেনেশুনে খাতা নিয়ে
পদ্য লিখি আজ।
লিখতে লিখতে হাত ব্যথা
ফুরিয়ে এল খাতার পাতা,
লিখতে গিয়ে পেন খারাপ
কালি হয়েছে শেষ,
মা ডাকেন, ঘুমাও এখন
রাত হয়েছে বেশ।

দীপান্বিতা বিশ্বাস,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ,
বড় জাগুলী, নদীয়া।

ছোট্ট সোনা, সোনা রায়

কালো কুচকুচে মাথাটি
লাল টুকটুকে ছাতাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়, সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়, সোনা রায়।

পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
তবে ফিরে আয়, ফিরে আয়
ওরে ছোট্ট সোনা, সোনা রায়।

বীথি পাঁজা,
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী,
গ্রামহিতকারী গার্লস স্কুল (প্রাথমিক)
মাশিলা, হাওড়া

বৃষ্টি

জল থেকে মেঘ হয়,
মেঘ থেকে বৃষ্টি,
ঈশ্বরের কী যে এই অপরূপ সৃষ্টি।
কিন্তু যদি এই শহরে হয় জোর বৃষ্টি
মনে হয়, হায় হায় একি অনাসৃষ্টি!
পথ-ঘাট ডুবে যায়, বাস চলে সাঁতরে
ঢেউ খেলে রাস্তায়, দেখে লাগে মজা রে

মুকুলিকা লাহা,
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী, ডাফ স্কুল, কলকাতা

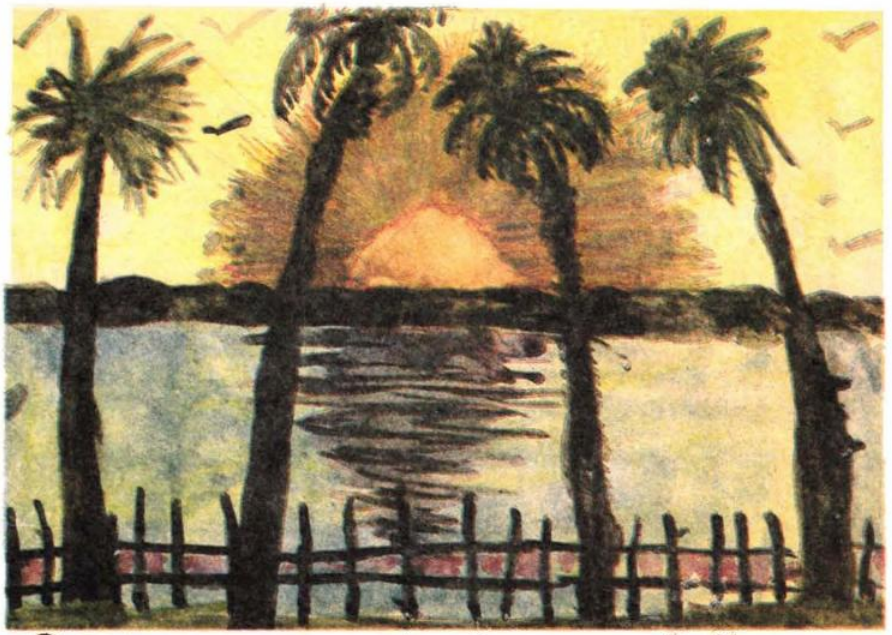

সন্দীপকুমার **সমাদ্দার, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, সোদপুর চন্দ্রচূড়** বিদ্যাপীঠ, সোদপুর

শতরূপা ঘোষ, বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী,
সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট, সাঁওতালডিহি

গগন স্টুডিও

ভবানীপুরের গগনবাবু,
চৌধুরী তাঁর পদবী।
এখনো কি আছেন বেঁচে,
এখনো কি আঁকেন ছবি?
রাত দুপুরে জ্বালিয়ে বাতি
সামনে মডেল, আঁকেন কি?
পড়শী-ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে আলো
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কি?
বেঁচে যদি থাকেন আজও
তুলি যদি ধরেন হাতে,
সত্যজিতের একটি ছবি
আঁকেন যেন আজকে রাতে।
হাতছানিতে ডাকেন যদি
আসেন যদি রায় মশাই,
ভবানীপুরে যাবোই তবে,
সেই স্টুডিয়োয় যাবো সবাই।

দোলা চক্রবর্তী, বয়স এগারো, সপ্তম শ্রেণী হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল।

সহেলী নন্দী, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় কলকাতা

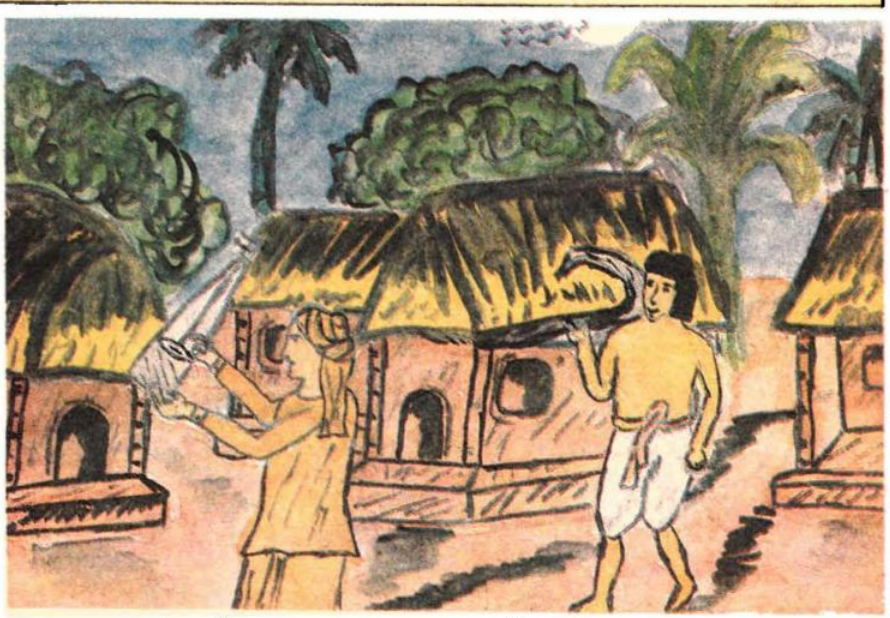

প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, সেন্ট পলস স্কুল কলকাতা

যুগ-যুগান্তের যাত্রী — ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আচম্বিতে রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে জাগল এক ভয়াবহ কণ্ঠস্বর — ক্যারাটে-যোদ্ধার রণহুঙ্কার ! সেই ভীষণ শব্দে কয়েকমুহূর্তের জন্যে স্থাণু হয়ে গেল গুণ্ডার দল। রণনিপুণ ক্যারাটেকার পক্ষে সেই সময়টুকু যথেষ্ট — বিদ্যুৎঝলকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নিখিল...
ইয়াহ্
উঃ!
ইয়ায়া-হা!
এতো দেখছি সাংঘাতিক লোক! ছুরিহাতে গুণ্ডাদের খালিহাতে পিটিয়ে কাবু করে ফেলছে। এই লোকটা আরও বড় গুণ্ডা, আশে-পাশে কোথাও ওৎ পেতে ছিল — এখন শিকার ফসকায় দেখে চোরের উপর বাটপাড়ি করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
এ আবার কোন্ গগনের চাঁদ, আমাদের এলাকায় ঢুকে ঝামেলা পাকাচ্ছে! একে হাফিজ করতে না পারলে এই এলাকায় আমাদের কারবার নির্ঘাত গুটিয়ে ফেলতে হবে।
৮-4

(চলবে)

বরফচাপা খনি

সঙ্কর্ষণ রায়

হলেও সার্চ শুরু হবে। উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফ-রাজ্যের মধ্যে সার্চ।'

'সার্চ! কিসের জন্য সার্চ?'

'বরফ-রাজ্যে বরফের তলায় চাপা-পড়া গুপ্তধনের জন্য সার্চ। প্রফেসর হাচিনসনের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেলেই আবার

ফিরে যাব। কানাডার একটি বড় ব্যাঙ্কের মালিক এই কাজের জন্য টাকা খরচ করতে রাজী হয়েছেন।'

'রিসার্চের পর সার্চ শুরু করতেই যখন হবে, তখন হাচিনসনের সবুজ সঙ্কেতের জন্য ওখানে অপেক্ষা না করে কলকাতায় চলে এলে কেন?'

'এই সার্চের ব্যাপারেই এসেছি। কানাডার উত্তর মেরু অঞ্চলের একজন এক্সপ্লোরার কলকাতায় চলে এসেছে, নাম তার প্রবীর গুহ। ওখানকার বরফ-রাজ্যের গুপ্তধনের কিছু গুপ্ত খবর তার কাছে আছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করব।'

কলকাতা শহরের পথ-ঘাট, অলিগলি সার্চ করেও কিন্তু প্রবীরের খোঁজ পায় না শ্যাম। প্রফেসার হাচিনসনকে সে কথা জানাতেই তিনি লিখলেন, 'প্রবীর বোধহয় কানাডায় ফিরে এসেছে আর উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফ-রাজ্যের মধ্যে আবার তার সার্চ শুরু করেছে। তাকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাকে কানাডায় ফিরে আসতে হবে। টাকা পাঠালাম, তাড়াতাড়ি চলে এস....'

শ্যাম লণ্ডনে পৌঁছতেই অধ্যাপক হাচিনসন বললেন, 'আর দেরি নয়, শুরু কর সার্চ। টিমিন্‌সের জেমস ম্যাকমিলিয়নের ধারণা, হাডসন সাগরের ধারে বরফ-রাজ্যের মধ্যে গুপ্তধন চাপা আছে। তোমাকে আগেই জানিয়েছি, জেমস মস্ত বড়লোক, টিমিন্‌সের কাছে তাঁর বিরাট র‍্যাঞ্চ আছে। র‍্যাঞ্চ কাকে বলে জান তো?'

'জানি, র‍্যাঞ্চ হলো গোপালন ক্ষেত্র।'

'হ্যাঁ। হাজার হাজার গোরু-মোষ আছে জেমসের র‍্যাঞ্চে। তোমাকে দিয়ে যে এক্সপ্লোরেশন তিনি করাবেন, তার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করবেন। এ সামর্থ্য তাঁর আছে, কারণ র‍্যাঞ্চ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার উর্পাজন করে চলেছেন তিনি। জেমসকে আজই খবর পাঠাচ্ছি, তোমার সফরের জন্য তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।'

গাড়ি এল। বিশেষ ধরনের ভ্যান, যার নাম উইনিবাগো। ড্রাইভারের আসনের পেছনেই পাশাপাশি দুটো কামরা আছে তাতে। কামরা দুটোতে খাওয়া-শোওয়ার সব রকম ব্যবস্থা আছে। ছোটখাট চলমান বাড়ি যেন।

উইনিবাগোটি চালিয়ে নিয়ে যে এসেছিল, তার নাম পিটার হাটি। জেমসের র‍্যাঞ্চে সে চাকরি করে। পশুপালন তার পেশা হলেও ভূতত্ত্বের জ্ঞান আছে তার। সে বললে যে শ্যামের সঙ্গে সেও বেরোবে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে।

বেরিয়ে পড়ে ওরা।

হারানো নকশা

লণ্ডন-অন্টেরিওর সীমানা পেরিয়ে যেতেই অন্টেরিও হ্রদ। রাস্তা হ্রদের ধার দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। হ্রদের ধারে শস্যক্ষেত। একটানা বহুদূর পর্যন্ত তার বিস্তার। এরই মধ্যে নর্থ বেরী নামক শহর। নর্থ বেরী পেরিয়ে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার এগিয়ে যেতে শেষ হলো শস্যক্ষেত্রের এলাকা, শুরু হলো বনভূমি। আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার মতো ঘন বন অবশ্য নয়। গাছপালাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা। যে সব গাছ দেখা যাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে স্প্রুস্, উইলো, বালসাম, পাইন, সেডার ইত্যাদি। মাঝে মাঝে চেখে পড়ে ওয়ালনাট্ ও অ্যাশ। পাথুরে জমির ওপরে মাটির আবরণ ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও গাছপালাগুলো বেশ সতেজ ও সবুজ।

বনের গাছপালা শ্যামের দৃষ্টি অধিকার করে রাখলেও মাটির দিকেও সে নজর দেয়, কারণ পেশায় সে ভূতাত্ত্বিক। মাটির ফাঁকে ফাঁকে পাথরের স্তর চোখে পড়ে। অদ্ভুত চাঁচাছোলা চেহারা এখানকার পাথরের। শ্যাম বুঝতে পারে যে এসব হচ্ছে গ্লেসিয়ারের বা হিমবাহের ক্রিয়ার ফল। সুমেরু অঞ্চলের তুষারক্ষেত্র থেকে হিমবাহ নেমে এসে এখানকার গ্রানাইট পাথরের স্তূপগুলোকে চেঁছে সমান করে দিয়েছে।

হিমবাহের গভীরতার স্বাক্ষর আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল শ্যাম। জায়গাটির নাম প্যারি সাউন্ড। এখানে পরপর কয়েকটি হ্রদ রয়েছে। হ্রদগুলো আসলে হিমবাহের ক্রিয়ায় মাটি ও পাথরের স্তরের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষত। ক্ষতগুলো জলে ভরে গিয়ে হ্রদের আকার নিয়েছে। শীতকালে অবশ্য হ্রদগুলোর জল বরফে জমাট বাঁধে। হ্রদের বরফ একাকার হয় ডাঙ্গার বরফের সঙ্গে।

স্প্রুস ও বালসাম গাছের বন হ্রদটিকে ঘিরে রেখেছে। সবুজ বনের মাঝখানে নীল হ্রদ। কিন্তু জলের রং পুরোপুরি নীল নয়। জায়গায় জায়গায় যেন ধূসর রঙের ছোপ পড়েছে।

কেন এই ধূসর রং ভেবে পায় না শ্যাম। তার অনুরোধে হ্রদের ধারে উইনিবাগো থামায় পিটার। নেমে আসে শ্যাম। হঠাৎ দেখে, ধূসর রঙের ছোপগুলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পিটারকে প্রশ্ন করে, 'ওগুলো কি পিটার?'

'ওগুলো হচ্ছে লুল পাখি।' পিটার জবাব দেয়। 'লুল হচ্ছে সুমেরু অঞ্চলের হাঁস। ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। শীতকালে দক্ষিণ দিকে উড়ে গিয়েছিল, গ্রীষ্মে বরফগলা শুরু হতেই ফিরে এসেছে। কিছুদিন বাদে আরও উত্তরে যাবে। একটা মজার ব্যাপার হলো, লুল পাখিরা নির্দিষ্ট পথ ধরে যাতায়াত করে। আকাশের পথ মানে আকাশের নির্দিষ্ট অংশ। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ওদের যাতায়াতের আকাশপথের ঠিক নিচেই রয়েছে ডাঙার প্রাণী, অর্থাৎ মেরু-ভাল্লুক ও মুজদের যাতায়াতের পথ। এই নির্দিষ্ট পথ ধরেই তারা শীতকালে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যায়।

'কোথায় এই পথটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার?'

'এ পথ আমি চিনি না, চেনে মেরী স্মিথ। সে এই পথটাকে জরিপ করছে। ওর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতেও পারে।'

টিমিন্‌সে পৌঁছতে রাত আটটা বাজল। সময়ের হিসেবেই রাত, কিন্তু ঝলমল করছে দিনের আলো। মেঘমুক্ত আকাশে তখনো সূর্য বিরাজ করছে।

নিশীথ-সূর্য। শেষ রাত্রের দিকে মাত্র দু-তিন ঘণ্টার জন্য সূর্য অস্ত যায়। অতি সংক্ষিপ্ত সন্ধ্যা ও রাত ছাড়া একটানা রোদে ঝলমল দিনের আলোর পালা চলে। টিমিন্‌সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জেমস ম্যাকমিলিয়ান। শ্যামকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় সে। বলে, 'এখানে একটি হোটেলে তোমাদের জন্য ঘর ভাড়া করে রেখেছি, সেখানে ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম করে শুরু করে দাও তোমাদের কাজ। প্রথমে পীয়ের মূরের কাছে যাবে। তার কাছে আছে একটি নকশা।

সেই নকশাটিতে সোনার খনির হদিস আছে। ওর কাছ থেকে নকশাটি নিয়ে খনিটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।'

শ্যামদাস অবাক হয়ে জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাতে সোনার মতো মূল্যবান ধাতুর হদিস আছে, পীয়ের মূর আমাদের তা দিয়ে দেবে! সোনার প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই?'

'না নেই।' জেমস জবাব দিল। কারণ সে ট্র্যাপিং নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকে। ট্র্যাপিং হচ্ছে ফাঁদ পেতে সীল মাছ ও মাস্ক র‍্যাট শিকার করা। ট্র্যাপিং করতে করতে নকশাটি তার হাতে এসেছে। নকশাটির হদিস অনুসরণ করে সোনার খনি খুঁজে বার করার সময় তার নেই, কাজেই সে আমাকে লিখেছে তার কাছে একজন জিয়োলজিস্ট পাঠিয়ে দেবার জন্য। আমার র‍্যাঞ্চের এলাকার মধ্যে তো কোনো জিয়োলজিস্ট নেই, কাজেই প্রফেসর হাচিনসনের শরণাপন্ন হয়েছি।'

রাতের খাওয়া সেরে শ্যাম ও পিটার শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। পিটার ঘুমিয়ে পড়লেও শ্যামের চোখে ঘুম নেই। আকাশে সূর্য, এমন রাতে ঘুমোবার অভ্যাস তার নেই।

শেষ রাতে ভোর তিনটায় সূর্য অস্ত যায়, তারপর ওঠে ভোর পাঁচটায়। সূর্য উঠতেই পিটার ঘুম থেকে উঠে বললে, 'চল, আবার শুরু করি আমাদের যাত্রা।'

আবার শুরু হলো পিটার ও শ্যামের যাত্রা। বাহন সেই উইনিবাগো। টিমিন্‌স শহরের সীমা পেরোতেই ফাঁকা মাঠ ও হ্রদ। হ্রদের ধার দিয়ে উত্তর অভিমুখে যেতে যেতে তারা সুমেরু বৃত্ত পেরিয়ে যায়। শুরু হয় স্থায়ী তুষারক্ষেত্র।

বরফের স্থায়ী ক্ষেত্র হলেও মাটির ওপরকার বরফের আবরণ সরে গিয়েছে। বরফের ঢাকনা সরে গেলেও মাটির নিচে বরফের স্তর অক্ষত রয়েছে। মাটি খুঁড়লেই তা বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালে মাটির তলার এই বরফই হচ্ছে সুমেরু অঞ্চলে জলের একমাত্র উৎস।

সামনে হাডসন সাগর, পেছনে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। এই ভয়াবহ নির্জনতার মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে। লক্ষ্য, পীয়ের মূরের লগ্ কেবিন। পথ নেই কোনো, তথাপি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে নিশ্চিন্তমনে উইনিবাগো চালাতে থাকে পিটার। বহুবার এসেছে সে পীয়েরের লগ্ কেবিনে, কাজেই এই ফাঁকা মাঠের পথহীন পথ ধরে গাড়ি চালাতে তার কোনো অসুবিধে হয় না।

একটানা প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে উইনিবাগো চালাবার পর পীয়েরের লগ্ কেবিনের সামনে গাড়ি থামাল পিটার।

গাড়ির শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পীয়ের। বলে, 'ওঃ তোমরা এসে গিয়েছ! জেমসের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তোমাদের আসার আশায় দিন গুনছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, যে নকশার জন্য তোমরা এসেছ, গতকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। কাবার্ডের মধ্যে রেখেছিলাম, মনে হচ্ছে কেউ ওটাকে তুলে নিয়েছে।'

'কেউ তুলে নিয়েছে মানে!' পিটার অবাক হয়ে বললে। 'এই জনমানবশূন্য জায়গায় কি কেউ আসে?'

'এই তো তোমরা এসেছ। মাঝে মাঝে দু'-একজন ট্র্যাপার আসে। মেরীও আসে। গতকালই এসেছিল।'

শ্যামের দিকে তাকিয়ে পিটার বললে, 'মেরী মানে মেরী স্মিথ। তার কথা আগেই বলেছি তোমাকে। সেই মেয়েটি যে ক্যারিবু (বল্‌গা হরিণ), মুজ (সুমেরু অঞ্চলের বড়

একটি গর্ভবতী মুজকে শিকার করে অনুতাপ হয়েছিল তার।

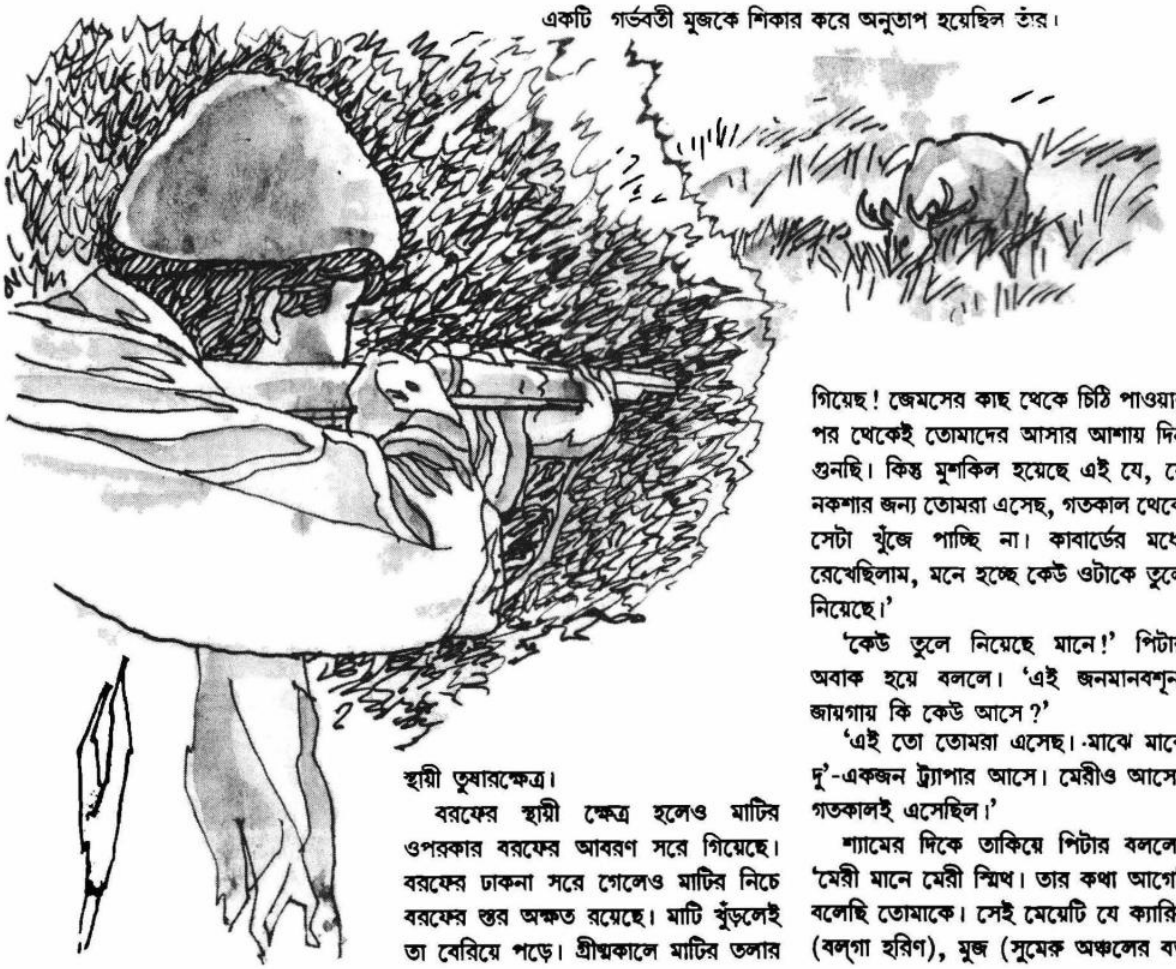

আকারের হরিণ) ও পোলার বেয়ারদের যাতায়াতের পথ জরিপ করছে।'

'এদের মধ্যে কাউকে তো চোর বলা চলে না!' পীয়ের বললে।

'তা অবশ্য বলা যায় না।' পিটার মৃদু হেসে বললে। 'তবে নকশা চুরি করাকে আমরা এক্সপ্লোরাররা দূষণীয় বলে মনে করি না। আমরা দুজনে এক্সপ্লোরার, মেরী স্মিথকেও এক্সপ্লোরার বলা যেতে পারে। আমরা দুজনে আজ এইমাত্র এসে পৌঁছেছি, কাজেই তোমার সন্দেহের আওতার মধ্যে আমাদের দুজনকে আনতে পার না। এখন বিবেচনা করে দেখ মেরীকে....'

'না, না, কক্ষণো না।' পীয়ের উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠে। 'মেরী বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মোৎসর্গ করেছে। সোনার ওপরে তার বিন্দুমাত্রও আসক্তি নেই। কাজেই তাকে কখনোই সন্দেহ করা যায় না। শোন পিটার, নকশাটি হারিয়ে গেলেও খনি যেখানে অবস্থিত সেখানকার নামটি আমার মনে আছে। একটি নয়, দুটি নাম দিয়ে জায়গাটিকে সনাক্ত করা যায়—মুজ রক্ ও ইয়েলো স্নো ক্রস্।'

'জায়গাটি কোনো গ্রাম না শহর?' শ্যাম প্রশ্ন করে।

'গ্রাম বা শহর নয়, কোনো লোকালয় তার ধারেকাছেও নেই, নামকরণ করেছে ওখানকার এস্কিমোরা।' পীয়ের বললে।

'নাম ছাড়া আর কিছু কি আপনার মনে আছে?' শ্যাম প্রশ্ন করে। 'জায়গাটির অবস্থান সম্বন্ধে বলতে পারেন?'

'না। নাম ছাড়া আর কিছুই মনে নেই।'

'শুধু নামে কি হবে! নাম জপ করে তো আর জায়গাটির হদিস পাওয়া যাবে না।' শ্যাম ঠাট্টার সুরে বললে।

'নাম থেকে জায়গাটির হদিস পাওয়া যেতেও পারে।' পিটার বললে। 'স্থানীয় এস্কিমোরাই হয়তো দিতে পারবে।'

বন্যপ্রাণীর সমাধি

দিন দুই বাদে আর একটি লগ্ কেবিনের সামনে উইনিবাগো দাঁড় করায় পিটার। এখানে একজন এস্কিমো ট্র্যাপার থাকে। বয়স তার আশি পেরিয়েছে। পিটারকে সে চেনে। দেখামাত্র খুশি হয়ে বললে, 'মাস্ক র‍্যাটের মাংসের রোস্ট করে রেখেছি। পুরোনো ভিনটেজ রেড ওয়াইনও আছে। খাবে?'

শোনামাত্র পিটারের জিভে জল এসে যায়। শ্যামের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে বললে, 'খাবে নাকি শ্যাম?'

'না।' শ্যাম জবাব দিল। 'তুমি যে হ্যাম-স্যাণ্ডুইচ্ করে রেখেছ, সেই আমার ভাল। রেড ওয়াইনের বদলে বরফ গলানো জল।'

'ঠিক আছে, তুমি তোমার রুচিমতো খাও, আমি এস্কিমো বুড়োর আতিথেয়তা গ্রহণ করি।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর পিটার বললে, 'শোন বুড়ো, তুমিও তো আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো, তুমি কি মুজ রক্ ও ইয়োলো স্নো ক্রসের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই।' এস্কিমো বুড়ো জবাব দিল। 'নাম শোনা শুধু নয়, চোখেও দেখেছি।'

'চোখে দেখেছ তো আমাদেরও দেখাও।'

'এখন তো চোখে ভাল দেখি না, এখন কি আর পারব তোমাদের দেখাতে। তোমরা নিজেরাই দেখ গিয়ে।'

'কোথায় যাব বল? জায়গাটির অবস্থান বল?'

'এখান থেকে সোজা উত্তরে চলে যাও। তোমাদের এই উইনিবাগো করেই পারবে যেতে। যেতে যেতে থামবে মেপল গাছের বনের ধারে। থামতেই হবে, কারণ বনের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাতে পারবে না। মেপল গাছ চেন তো? না চিনলেও ক্ষতি নেই, কারণ মেপল গাছকে তার ফুল দিয়ে যায় চেনা। গাছগুলো সব এই সময়ে টকটকে লাল রঙের ফুলে ভরে থাকে, দেখে মনে হয় বনে যেন আগুন লেগেছে। এই বনের মধ্যে আছে বনের প্রাণীদের সমাধিক্ষেত্র। সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একটি মুজ-এর কবরের ওপরে একটি পাথরের ফলক বসানো আছে। তাকেই বলে মুজ রক্।'

অবাক হয়ে এস্কিমো বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যাম বললে, 'বন্য প্রাণীদের সমাধিক্ষেত্র মানে! বন্য প্রাণীদের মৃতদেহ তোমরা কবর দাও বুঝি?'

'আমরা দেব কেন!' এস্কিমো বুড়ো বললে। 'বন্য প্রাণীরা নিজেরাই দেয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় তারা প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু আসন্ন হলেই তারা চলে যায় সেখানে। স্মৃতিফলকটি অবশ্য আমাদের একজন পূর্বপুরুষ লাগিয়েছিলেন। একটি গর্ভবতী মুজকে শিকার করে অনুতাপ হয়েছিল তাঁর। তাকে কবর দিয়ে তার ওপরে একটি বড় গ্র্যানাইট পাথর বসিয়েছিলেন তিনি। পাথরটিকে অনেক দূর থেকে দেখা যায়।'

'আর ইয়েলো স্নো ক্রস? সেটা কোথায় আছে?' পিটার প্রশ্ন করে।

'কাছেই আছে।' এস্কিমো বুড়ো জবাব দিল। 'তবে তাকে চোখে দেখিনি। কারণ শীতকালেই তাকে দেখা যায়।'

এস্কিমো বুড়োর নির্দেশমতো পিটার ও শ্যাম কম্পাস দিয়ে দিকনির্ণয় করে সোজা উত্তরদিকে উইনিবাগো চালাতে থাকে। একটানা প্রায় দুই ঘণ্টা ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে মেপল বনের প্রান্তে গাড়ি থামায়।

ঘন বন, পথ নেই কোনো। গাড়ি থেকে নেমে তারা বনের মধ্যে ঢোকে। লাল ফুলে ছেয়ে আছে প্রতিটি মেপল গাছ। বনে যেন আগুন লেগেছে।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পিটার ও শ্যামের মনে হলো বন যেন ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে। হঠাৎ তারা এমন জায়গায় পৌঁছল যেখানে বন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখানে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘাস ও শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে পাথর ছড়ানো। পাথরে হিমবাহের স্বাক্ষর আছে।

এইসব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলির মধ্যে একটি গ্র্যানাইট পাথরের ফলক স্তম্ভের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটাই মুজ রক্।

শ্যাম বললে, 'এটাই যে মুজ রক্ তার প্রমাণ কি?'

'এস্কিমো বুড়ো বলেছে, তাই প্রমাণ।' পিটার বললে। 'আর কোনো প্রমাণ দেওয়া খুবই কঠিন।'

এমন সময় উত্তর দিগন্তে ঝড়ের আভাস পাওয়া যায়। একটা বিপুল আকারের ধোঁয়াটে ঢলের মতো ঝড় নেমে আসছে যেন। অথচ বাতাসে তার কোনো আভাসই নেই। পিটার ও শ্যাম দুজনেই হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে থাকে।

'ঝড় নয় শ্যাম!' হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে

উঠল পিটার, 'একপাল মুজ। তেড়ে আসছে আমাদের দিকেই। পালাও...'

'মুজ কোথায়?' শ্যাম বললে। 'আমি তো ধুলো ছাড়া কিছুই দেখছি না।'

'ভালো করে দেখলেই দেখতে পাবে। কিন্তু এখন দেখার সময় নেই, বাঁচতে চাও তো পালাও।'

কিন্তু দৌড়ে বেশিদূর যেতে পারে না তারা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একপাল মুজ ঘিরে ফেলে তাদের।

মুজ-এর পালের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী। তার পরনে ব্রিচেস্ ও জ্যাকেট, মাথায় টুপি ও কাঁধে বন্দুক।

'এই যে মেরী।' মেয়েটিকে দেখামাত্র পিটার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'শ্যাম, এই হলো মেরী স্মিথ। এর কথা আগেই তোমাকে বলেছি। আর মেরী, এই হলো শ্যাম।'

'বুঝেছি, জেমস ম্যাকমিলিয়ন একেই লাগিয়েছে সোনার খনি খুঁজে বের করার কাজে।' মেয়েটির চোখ দুটি ঝলসে উঠল।

'না।' শ্যাম বললে। 'আমি প্রফেসার হাচিনসনের নির্দেশমতো রিসার্চ করে যাচ্ছি।'

'রিসার্চ মানে সার্চ এ্যাণ্ড সার্চ, তাই না?' মেরী ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল। 'রিসার্চের ছদ্মবেশে গোল্ড মাইনের জন্য সার্চ চালিয়ে যাচ্ছ, তাই না?'

'প্রফেসার হাচিনসন একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিক।' শ্যাম গম্ভীরমুখে বললে। 'রিসার্চের ছদ্মবেশে কোনোরকম অপকর্ম চালিয়ে যাওয়া মোটেই বরদাস্ত করবেন না তিনি।'

'জানতে পারি কি ধরনের রিসার্চ এই মুজ রকের চারপাশে চালিয়ে যাচ্ছ?' মেরী প্রশ্ন করে।

'শুনেছ তো শ্যাম, নিঃসন্দেহে এটাই মুজ রক্।' পিটার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল।

'এখানে কোনো রিসার্চ করছি না।' শ্যাম বললে, 'এখানে মেপল দিয়ে ঘেরা মুজ রক্ দেখতে এসেছি।'

'দেখতে এসেছ তো দেখ, কিন্তু দেখার নাম করে সোনার খনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে।' মেরী গম্ভীর মুখে বললে।

'এখানে সোনার খনি আছে বুঝি?' নিরীহ গোবেচারির মতো মুখ করে প্রশ্ন করে পিটার।

'আছে না বলে, ছিল বলা উচিত।' মেরী বললে। 'কিন্তু মুজ ও ক্যারিবুদের চলাচলের পথের ওপরে খনিটি গড়ে উঠেছিল বলে তারা খননকারীদের পিষে মেরে খনির কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। খনিটাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে গেলে তোমাদেরও এই দশা হবে।'

'না, না, খনির কথা ক্ষণিকের জন্যও ভাবি না।' পিটার বললে। 'মুজ রক্ দেখলাম, এর পর ইয়েলো স্নো ক্রস দেখতে চাই।'

'ইয়েলো স্নো ক্রসের খবর আমি রাখি না।' মেরী বললে। 'তবে এই সময়ে স্নো ক্রস দেখার আশা রেখো না। স্নো ক্রস দেখতে হলে শীতকালে এখানে আসতে হবে।'

'শীতকালে এখানে মুজরা আসে না?' শ্যাম উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'না।' মেরী জবাব দিল। 'মুজরা তখন দক্ষিণে চলে যায়। ক্যারিবুরাও যায়।'

পিটার বললে, 'মেরী, তোমার মুজরা এখনো ঘিরে রয়েছে আমাদের। এখানকার দেখাও তো শেষ হলো, এখন আমাদের যেতে দাও এখান থেকে।'

'যেতে দেব যদি কথা দাও যে আর কখনো এমুখো হবে না।' মেরী বললে।

'আর এমুখো হবার কোনো উপলক্ষই হবে না।' পিটার বললে। 'মুজ রক্ দেখা হলো, এর পর আর এখানে আসবই বা কিসের জন্য।'

'ঠিক আছে, আমি মুজদের তোমাদের যেতে দিতে বলছি।'

বলে দুহাত তুলে হাততালি দিল মেরী। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল মুজের পাল। তারা ঢুকে পড়ল মেপলের বনের মধ্যে।

'চলি আমরা, বনের বাইরে আমাদের উইনিবাগো রয়েছে।' পিটার বললে।

'আমাকেও নিয়ে চল।' মেরী বললে।

'তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

ভয়ঙ্করী মেরী

উইনিবাগোর মধ্যে পাশাপাশি দুটো ক্যাম্প খাট ছিল। তাদের একটিতে টান হয়ে শুয়ে পড়ে মেরী বললে, 'সোজা চল জেমস ম্যাকমিলিয়নের র‍্যাঞ্চে।'

'সোজা জেমসের র‍্যাঞ্চে আমাদের যাওয়ার কথা তো নয়।' পিটার বললে। 'আরও দু-চার জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পর....'

'না। সোজা যাবে সেখানে।'

'সোজা সেখানে যেতে চাও তো তোমার নিজের উইনিবাগোতে চেপে গেলেই পার।' পিটার ঝাঁজালো স্বরে বললে। 'আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ কেন?'

'তোমাদের অকাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে সৎকাজই করেছি।' মেরী শান্তভাবে বললে। 'আমি চাই এখন থেকে কাজের মতো কাজে নিযুক্ত থাক তোমরা।

টিমিন্স হয়ে জেমস ম্যাকমিলিয়নের র‍্যাঞ্চে গিয়ে পৌঁছাল তারা। জেমসের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে মেরী বললে, 'এত বড় একটা র‍্যাঞ্চের মালিক, কানাডার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী তুমি, আরও টাকার লোভ কেন তোমার?'

উত্তরে জেমসের মুখে কোনো কথা যোগায় না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

সেদিন গভীর রাত্রে গেস্ট হাউজে পিটার ও শ্যামের ঘরে ঢুকে জেমস বললে, 'তোমরা তোমাদের কাজ বন্ধ করে দাও। আমার তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো মদত আর পাবে না তোমরা।'

অবাক হয়ে জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে পিটার বললে, 'ব্যাপার কি জেমস? মেরীকে এত ভয় পাও তুমি?'

'ওকে কে না ভয় পায়!' মুখ কাঁচুমাচু করে জেমস বললে। 'তোমরাও যে ভয় পাও তার প্রমাণ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে তোমরা চলে এসেছ। তার মুজ ও ক্যারিবু বাহিনী যে কোনো সৈন্যবাহিনীর চেয়ে ভয়ঙ্কর, তাদের দিয়ে সে আমার র‍্যাঞ্চকে নষ্ট করে ফেলতে পারে।'

শ্যাম বললে, 'মেরী আমাদের জোর করে নিয়ে এলেও আমাদের কাজ আমরা চালিয়ে যাব। আপনার মদত না পেলেও এ কাজ করব, কারণ আমরা এক্সপ্লোরার, আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে খুঁজে বের করার নেশা।

হঠাৎ যেখানে বন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে

রাত্রে শ্যামের চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে সে। মুজ রকের কাছাকাছি সোনার খনি আছে বলে মনে হয় না। মেরী তার মুজের পাল নিয়ে আসার আগে কিছুটা খোঁজাখুঁজি সে করেছিল। তার মনে হচ্ছে ইয়েলো স্নো ক্রসের কাছেই আছে খনিটা। এস্কিমো বুড়ো বলেছিল, মুজ রক্ থেকে স্নো ক্রসের দূরত্ব বেশি নয়। কিন্তু শীতে বরফ জমলে পরই তাকে দেখা যাবে। এই গ্রীষ্মকালে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই।

পরদিন সকালে পিটারকে সে বললে, 'বুঝলে পিটার, আপাততঃ এই অনুসন্ধান আমাদের বন্ধ রাখতে হবে, কারণ এখন আর কিছুই দেখা যাবে না, যা দেখে খনির হদিস পাওয়া যেতে পারে। শীতকালে বরফ জমলে পর ইয়েলো স্নো ক্রস আত্মপ্রকাশ করবে।'

সব কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন প্রফেসার হাচিনসন। তিনি বললেন, 'জেমস মদত না দিলেও আমি মদত দেব। শীতকালে তুমি ইউনিভার্সিটির সী-প্লেন নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।'

'সী-প্লেন দিয়ে কি হবে স্যার?' শ্যাম অবাক হয়ে বলল। 'শীতে তো সী-ও বরফে জমাট বাঁধবে।'

'বরফের ওপরে সী-প্লেন ল্যান্ড করতে পারবে। ইয়েলো ক্রসের ওপরেই নামতে পারবে।

ইয়েলো স্নো ক্রস

শীতে মেরু অঞ্চলে বরফ জমতে শুরু করতেই সী-প্লেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শ্যাম ও পিটার। এই সময়ে বরফের সঙ্গে অন্ধকারও মেরু অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দিনরাত একটানা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে অস্ফুট আলো ফুটে ওঠে বরফের ওপরে। হয়তো বরফে ঠিকরে আসা তারার আলো। বরফের নিজস্ব আলোও হতে পারে। যে আলোই হোক না কেন বরফের স্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সী-প্লেনের চালকের আসনে বসেছিল পিটার। একটানা বরফের ওপর দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেও মুজ রক্‌কে খুঁজে বের করে সে। বরফের বুক ফুঁড়ে বরফের স্তম্ভের আকারে দাঁড়িয়ে আছে।

মুজ রকের চারপাশে চক্কর খেতে খেতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য তাদের চোখে এল। সাদা বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের আলো। আকারে ক্রসের মতো।

সাদা বরফের মধ্যে এই হলুদ আলো এল কোথা থেকে? এই প্রশ্নের জবাব প্রচ্ছন্ন আছে বরফের তলার পাথরের মধ্যে। সম্ভবত পাথরের মধ্যে পারদ আছে, সেই পারদ পাথর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে বরফে মিশেছে ও বরফকে উজ্জ্বল হলুদ রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে।

'কিন্তু বরফের সাদা পটের ওপরে হলুদ রঙ এই ক্রসের আকার নিয়েছে কেন।' প্রশ্নটা পিটার করে।

একটু চিন্তা করে শ্যাম জবাব দিল, 'বরফের নিচে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে বলেই বোধহয় এমন হয়েছে।'

হতবুদ্ধির মতো শ্যামের মুখের দিকে তাকিয়ে পিটার বললে, 'ক্রসের আকারে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে বলেই তার ওপরে জমা বরফ এমনি হলুদ রঙের ক্রসের আকার নিয়েছে।'

'ঠিক তাই। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে পাথর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে পারদ, আর মিশেছে জলের সঙ্গে। সেই জল বরফে জমাট বাঁধতেই এই উজ্জ্বল হলুদ রং প্রকাশ পেয়েছে।'

'তার মানে এখানেই ছিল খনিটা!' পিটার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'পারদ জলে মিশে এই হলুদ রং সৃষ্টি করেছে মানে খনিটা পারদের খনি ছিল।'

'কিসের খনি ছিল পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। সোনার খনিও হতে পারে, কারণ পাথর থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য পারদ ব্যবহার করা হয়। এখানে প্লেনটাকে ল্যান্ড করাও পিটার, ইয়েলো ক্রসটার কাছাকাছি।

ইয়েলো ক্রসের চারপাশে জমি এবড়োখেবড়ো বলে একটু তফাতে একটি সমতল ভূমির ওপরে প্লেনটাকে ল্যান্ড করায় পিটার।

'এটা বোধ হয় একটা হ্রদ।' প্লেন থেকে নেমে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে পিটার বললে। 'এ অঞ্চলে ডাঙা কখনো এমন মসৃণ হয় না।'

প্লেনের মধ্যে ছোট একটা স্লিডু বা তুষারযান ছিল। মোটর চালিত। সেটা নামিয়ে তাতে চেপে বসে তারা। এখান থেকে ইয়েলো ক্রসটা দেখা যাচ্ছে। একটানা সাদা বরফের মধ্যে তা ঝলমল করছে।

ইয়েলো ক্রস লক্ষ্য করে তুষারযান চালায় পিটার। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যতিক্রম মুজ রক্ ও ইয়েলো

ক্রস। মুজ রক্ থেকে ইয়েলো ক্রসের দূরত্ব তেমন কিছু বেশি নয়। কম্পাস দিয়ে দিক নির্ণয় করে শ্যাম বুঝতে পারে যে মুজ রকের ঠিক উত্তরে এই ইয়েলো ক্রসের অবস্থান।

সময়ের হিসেবে তখন দিন। কিন্তু আকাশে সূর্য নেই। অগণিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে আকাশ জুড়ে। তাদের আলো বরফে প্রতিফলিত হয়ে একটা স্নিগ্ধ দ্যুতি সৃষ্টি করেছে।

বরফে প্রতিফলিত এই আলো জোরালো না হলেও অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে দিয়েছে। এই আলোয় তুষারযান চালাতে কোনো অসুবিধে হয় না।

হঠাৎ একটা চোখ-ধাঁধানো আলোতে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শ্যাম চমকে উঠে বললে, 'এ কি!'

পিটার বললে, 'উত্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ শ্যাম, দেখলেই বুঝতে পারবে।'

শ্যাম তাকাল উত্তর দিকে। নিমেষে বিস্ময়ে সে নির্বাক হলো। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেনি। আকাশময় নীলাভ আলোর ছটা। যেন বিদ্যুতের স্রোত উত্তর দিগন্ত থেকে মাঝ আকাশের দিকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

পিটার বললে, 'একেই বলে অরোরা বোরিয়েলিস।'

'আরোরা বোরিয়েলিস' বা মেরুপ্রভার আলোতে ইয়েলো ক্রসকে আরও উজ্জ্বল দেখায়।

তুষারযানে চেপে ইয়েলো ক্রসের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় পিটার ও শ্যাম। ক্রসের আকারের উজ্জ্বল হলুদ রঙের আলো যেন পাতালপুরী থেকে বরফ ভেদ করে উঠেছে।

পিটার বললে, 'তুমি যাই বল না কেন, আমার মনে হচ্ছে এই হলুদ রঙটা যেন অপার্থিব কিছু। পাতালপুরীর গব্লিনদের (বামন-পরী) লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসা আলো।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' শ্যাম মৃদু হেসে বললে। 'কিন্তু এই রঙের উৎস যে মার্কারি বা পারদ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'তার মানে এখানে পারদের খনি আছে?'

'সোনার খনিও হতে পারে। তোমাকে

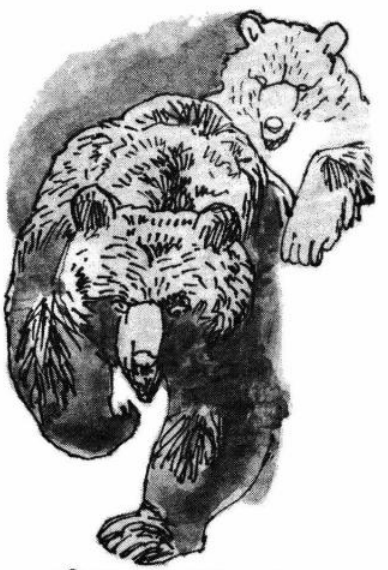

বেরিয়ে আসে একজোড়া সাদা ভাল্লুক।

আগেই বলেছি, পারদের লক্ষণ দেখা গেলে তাকে অনুসরণ করে সোনার খনি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। চল কাছে গিয়ে দেখি।'

কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাম।

'ব্যাপার কি, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?' পিটার প্রশ্ন করে।

'পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?' শ্যাম বললে। 'কে যেন আমাদের অনুসরণ করছে। এসে হাজির হয়নি তো?'

'অসম্ভব। দিন দুই আগে জেমস ও মেরীর মেক্সিকো সিটিতে যাওয়ার কথা। সেখানে কি একটা সেমিনার চলছে।'

'তাই বল।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শ্যাম। 'মেরীর আসার সম্ভাবনা যখন নেই, তখন তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরও দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নেই।'

'মেরীর সাঙ্গোপাঙ্গ মানে মুজ ও ক্যারিবুদের কথা বলছ তো? শীতকালে তারা দক্ষিণে চলে যায়, এ মুখো হয় না। কাজেই....'

নির্ভয়ে এগিয়ে যায় তারা। উজ্জ্বল হলুদ রঙের ক্রস-চিহ্নিত বরফের চারপাশে খোঁজাখুঁজি করে। পিটার বললে, 'এখানে কোনো খনি থেকে থাকলে তা বরফের তলায় চাপা পড়ে আছে।'

শ্যাম বললে, 'বরফের তলায় যা চাপা পড়ে আছে, তার নাগাল পেতে হলে বরফের মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। যন্ত্রপাতি তো সঙ্গেই আছে, এস শুরু করে দিই।'

খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতেই বরফের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করল তারা।

'দেখেছ পিটার, সুড়ঙ্গ!' শ্যাম উত্তেজিত স্বরে বললে। 'কারা যেন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খনির মধ্যে ঢুকেছে।'

সুড়ঙ্গের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে পিটার বললে, 'সুড়ঙ্গের মধ্যে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'এখন না থাক, ছিল নিশ্চয়ই। চল, ভেতরে ঢুকে পরীক্ষা করি।' বলে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে শ্যাম।

তাকে অনুসরণ করে পিটার বললে, 'কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ শ্যাম?'

'না তো।' শ্যাম জবাব দিল।

বরফের মধ্যে কাটা সুড়ঙ্গ প্রায় দশ মিটার ভেতরে গিয়ে পাথরের স্তরের মধ্যে কাটা সুড়ঙ্গে এসে মিশেছে। এই সুড়ঙ্গের মুখের ওপরে একটি কংক্রিটের ফলক লাগানো আছে। তাতে লেখা আছে: 'আর্কটিক গোল্ড মাইন, ১৮৭৫'।

শতাধিক বছরের পুরোনো সোনার খনি। শ্যাম আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, 'পেয়েছি।'

শ্যামের উচ্ছ্বাস পিটারকে স্পর্শ করে না। নিস্পৃহ স্বরে সে বললে, 'পেয়েছ তো খনির হদিস? হদিস পেয়েই খুশি থাকতে হবে। খনিটাকে পুনরুদ্ধার করতে তো আর পারবে না।'

'চেষ্টা করতে দোষ কি। রীতিমত খনন শুরু করতে না পারলেও কিছু সোনা বের করে নিয়ে যেতে পারব।'

'অসম্ভব। ঐ দেখ কারা যেন আসছে। আমাদের দিকেই আসছে.....'

খনি-সুড়ঙ্গের ভেতরকার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন জাগে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একজোড়া সাদা ভাল্লুক।

'পোলার বেয়ার।' পিটার চিৎকার করে ওঠে, 'পালাও।'

দৌড়তে শুরু করে পিটার। তাকে অনুসরণ করে শ্যামও দৌড়ায়। তাদের

অনুসরণ করে তেড়ে আসে ভাল্লুক দুটো।

বরফের ওপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে তারা তুষারযানে উঠে বসে। তুষারযানের যান্ত্রিক শব্দে থমকে দাঁড়ায় ভাল্লুক দুটো। এই সুযোগে তুষারযান চালিয়ে তারা সোজা চলে আসে তাদের সী-প্লেনের কাছে।

তাদের সী-প্লেনের পাশে আর একটি সী-প্লেন দাঁড়িয়েছিল। তারা সেখানে পৌঁছতেই প্লেন থেকে নেমে এল মেরী ও জেমস।

পিটার তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমরা এখানে? তোমাদের মেক্সিকোতে যাবার কথা ছিল না!'

'তোমরা এদিকে এসেছ জানতে পেরে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ মুহূর্তে বদলে দিয়েছি।' মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে মেরী বললে। 'তোমাদের দেখে বুঝতে পারছি যে পোলার বেয়ারদের আস্তানায় ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা।'

'পোলার বেয়ারদের আস্তানা কাকে বলছ!' শ্যাম উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল। 'ওটা তো একটা সোনার খনি।'

'না, এখন ওটা পোলার বেয়ারদের আস্তানা। ওর মধ্যে ঢোকার চেষ্টা আর কখনো করবে না।'

'না, করব না, কারণ এখানকার পালা আমাদের শেষ।' শ্যাম বললে। 'পিটার, চল আমরা যাই।'

'এখনই যাবে কি!' মেরী বললে। 'এটা ডিনার টাইম। চল আমাদের আস্তানায়, সেখানে বসে ডিনার খাবে।'

'এই বরফ-রাজ্যে তোমাদেরও আস্তানা আছে নাকি!' শ্যামের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

মেরীর আস্তানা

মেরী তার প্লেন থেকে একটি তুষারযান নামিয়ে নিয়েছিল। তাতে চেপে বসে সে পিটার ও শ্যামকে তাকে অনুসরণ করতে বলে।

দিগন্তবিস্তৃত বরফের ক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় বরফে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। এগুলো পাথুরে টিলা ছাড়া আর কিছু নয়। এমনি একটি বরফ-চাপা টিলা লক্ষ্য করে তুষারযান চালায় মেরী। টিলার কাছে এসে তুষারযান থামিয়ে নেমে পড়ে সে।

মেরীর তুষারযানের কাছে পিটারও তার তুষারযান থামায়। শ্যাম ও পিটার মেরীকে অনুসরণ করে টিলাটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখে যে তা টিলা নয়, বরফ দিয়ে তৈরি একটি বড় আকারের ইগ্‌লু।

ইগ্‌লু হলো বরফ দিয়ে তৈরি ঘর, যা এস্কিমোরা উত্তর ইউরোপ, উত্তর কানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডের বরফে আচ্ছন্ন অঞ্চলে বানিয়ে থাকে। এত বড় আকারের ইগ্‌লু তারা তৈরি করে না, কাজেই এই ইগ্‌লুটির দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে পিটার ও শ্যাম।

'হাঁ করে দেখছ কি!' মেরী ঠাট্টার সুরে বললে। 'এত বড় ইগ্‌লু আগে কখনো দেখনি?'

'না।' পিটার বললে। 'কে বানাল এমন ইগলু?'

যে বানিয়েছে সে ইগ্‌লুর ভেতরেই ছিল। তুষারযানের শব্দ এবং মেরী, পিটার ও শ্যামের কণ্ঠস্বর শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। তাকে দেখে আবার বিস্ময়ের পালা শ্যাম ও পিটারের। প্রবীর গুহ। বরফ-রাজ্যের মধ্যে খনিজ-সন্ধানী। শ্যাম ভেবেছিল তার সাহায্যেই সে সোনার খনিটাকে খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে তার হদিসই পায়নি।

প্রবীরকে শ্যাম মুখে কিছু বলতে না পারলেও মনে তার নানা প্রশ্ন জাগে। এখানে কি করছে সে? এমন চমৎকার একটা ইগ্‌লুই বা বানাল কি করে? ইগ্‌লু বানিয়ে এস্কিমোদের মতো শীতের মধ্যেও বরফ-রাজ্যে অবস্থান করছে। কি করছে সে এখানে? আর্কটিক্ গোল্ড মাইনের হদিস কি সে পেয়েছে?

প্রবীরের দিকে তাকিয়ে মেরী মুচকি হেসে বললে, 'তুমি যা খুঁজছ তা ইনি খুঁজে পেয়েছেন।'

'খুঁজে পেয়েছেন!' প্রবীরের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'নকশাটি তো আমি পীয়েরের লগ্ কেবিন থেকে চুরি করে এনে তোমাকে দিয়েছি।' মেরী বললে। 'নকশার সাহায্য ছাড়াই ইনি খুঁজে পেয়েছেন খনিটাকে!'

'কি করে খুঁজে পেলেন জানতে পারি কি?' প্রবীর প্রশ্ন করে।

মেরী বললে, 'কি করে খুঁজে পেলেন তা পরে শুনো। এখন আমরা সকলে ক্ষুধার্ত, আমাদের ডিনার খাওয়াও।'

'নিশ্চয়ই। টিন থেকে সুপ, চিকেন বের করে গরম করে নিতে দশ মিনিটও লাগবে না.....'

ইগ্‌লুর ভেতরটা বেশ গরম। গরম সুপ, মাংস ও রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে শ্যাম বললে, 'কি করে আর্কটিক গোল্ড মাইনটাকে খুঁজে পেলাম তা শুনে আর কি করবেন ডক্টর গুহ! খনিটা তো পোলার বেয়াররা দখল করে নিয়েছে!'

মেরী বললে, 'শুধু আর্কটিক গোল্ড মাইন নয়, এই বরফ-রাজ্যের অন্যান্য পরিত্যক্ত খনির খাদগুলোও এদের দখলে চলে গিয়েছে। বৃথা খুঁজছ তোমরা এই খনিগুলোকে।'

প্রবীর বললে, 'মেরী, আমাকে আমার এক্সপ্লোরেশনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বহুবার তুমি বুঝিয়েছ যে বন্য প্রাণীরা সোনার চেয়েও দামী! কিন্তু সোনা ও অন্যান্য ধাতুও তো কম দামী নয়। অতএব পরিত্যক্ত খনিগুলোকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত।'

'খনি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এদের ঘরছাড়া করা চলবে না।' মেরী ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল।

'অবশ্যই না, যেখানে আছে এরা, সেখানেই থাকবে। এদের কাজে লাগাতে চাই আমি, এদের সাহায্যেই খনি থেকে সোনা বা অন্যান্য ধাতু বের করতে চাই।'

'সে কি সম্ভব!' ভুরু কুঁচকে তাকায় মেরী প্রবীরের মুখের পানে।

'অবশ্যই সম্ভব। তুমি ও আমি দুজনেই এদের ভালবাসি, আমরা দুজনে চেষ্টা করলে এই অসম্ভবকে অবশ্যই সম্ভব করে তুলতে পারব।'

ছবি: সৃফি

কলম্বাসের উত্থান পতন

প্রসিত রায়চৌধুরী

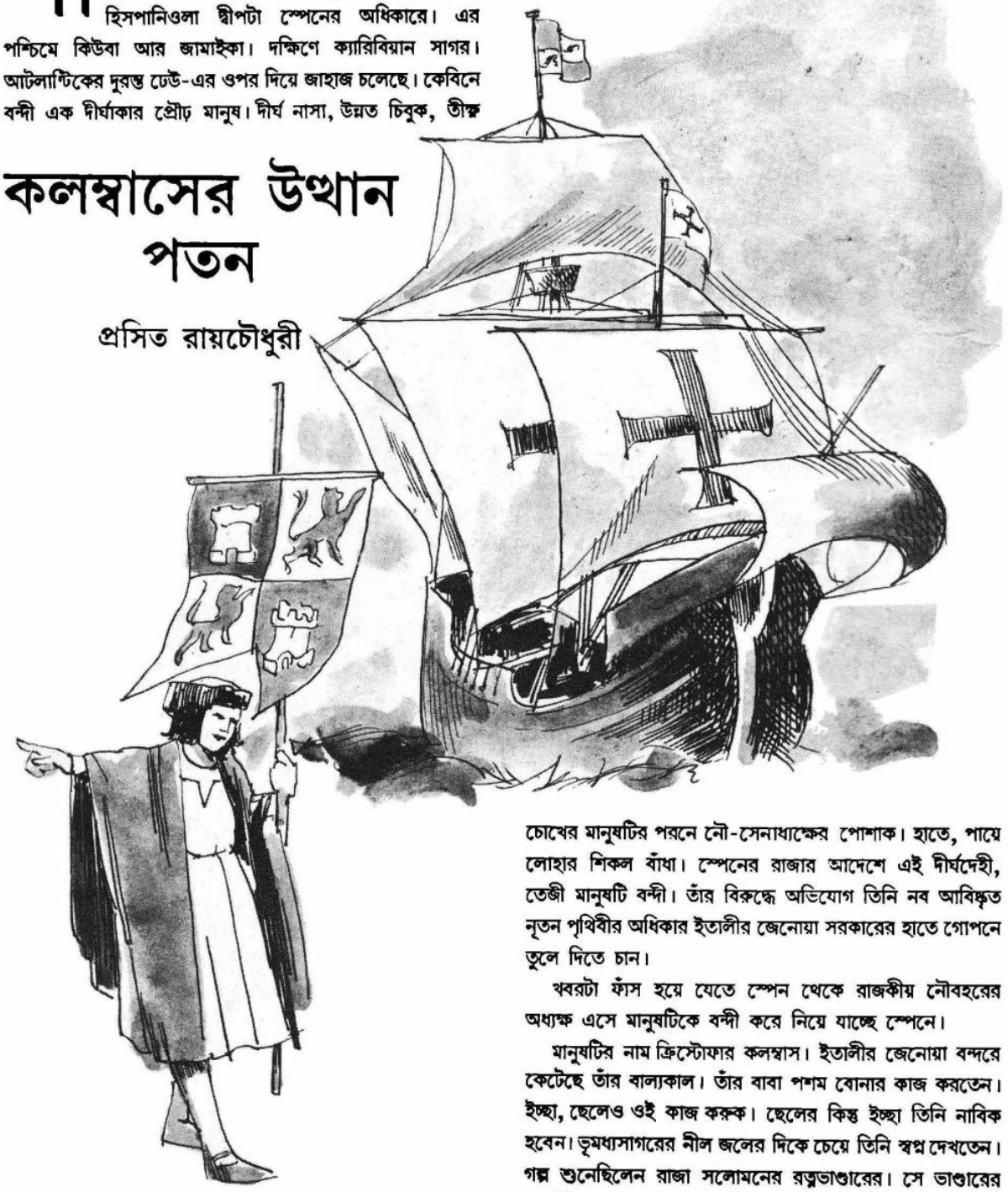

পাল তোলা জাহাজটা হিসপানিওলার লা ইসাবেলা বন্দর থেকে স্পেনের অভিমুখে যাত্রা করলো। হিসপানিওলা দ্বীপটা স্পেনের অধিকারে। এর পশ্চিমে কিউবা আর জামাইকা। দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগর। আটলান্টিকের দুরন্ত ঢেউ-এর ওপর দিয়ে জাহাজ চলেছে। কেবিনে বন্দী এক দীর্ঘাকার প্রৌঢ় মানুষ। দীর্ঘ নাসা, উন্নত চিবুক, তীক্ষ্ণ চোখের মানুষটির পরনে নৌ-সেনাধ্যক্ষের পোশাক। হাতে, পায়ে লোহার শিকল বাঁধা। স্পেনের রাজার আদেশে এই দীর্ঘদেহী, তেজী মানুষটি বন্দী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নব আবিষ্কৃত নূতন পৃথিবীর অধিকার ইতালীর জেনোয়া সরকারের হাতে গোপনে তুলে দিতে চান।

খবরটা ফাঁস হয়ে যেতে স্পেন থেকে রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ এসে মানুষটিকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে স্পেনে।

মানুষটির নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ইতালীর জেনোয়া বন্দরে কেটেছে তাঁর বাল্যকাল। তাঁর বাবা পশম বোনার কাজ করতেন। ইচ্ছা, ছেলেও ওই কাজ করুক। ছেলের কিন্তু ইচ্ছা তিনি নাবিক হবেন। ভূমধ্যসাগরের নীল জলের দিকে চেয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন। গল্প শুনেছিলেন রাজা সলোমনের রত্নভাণ্ডারের। সে ভাণ্ডারের সব হীরা জহরত আর সোনার স্তূপ নাকি এসেছিল ভারতবর্ষ

থেকে। কলম্বাস সামান্য লেখাপড়া জানতেন। ভূগোলের কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। ইউরোপের মানুষ জানতো না ভারতবর্ষটা ঠিক কোন দিকে। জলপথে কেমনভাবে যাওয়া যায়।

কলম্বাস ছিলেন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান পরিবারের সন্তান। মুসলমানেরা তখন তরবারির জোরে দখল করেছে খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেম। আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিশর তাদের পদানত। ইউরোপের দিকেও তারা হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে—দক্ষিণ স্পেন তাদের দখলে রয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে।

কলম্বাস ভাবতেন তিনি ভারতবর্ষ যাবেন, আনবেন হীরা, জহরত আর সোনা। সেই অর্থে গড়ে তুলবেন সৈন্যবাহিনী। নতুন করে ক্রুশেডের লড়াই শুরু করবেন। উদ্ধার করবেন জেরুজালেম তুর্কিদের হাত থেকে।

জেনোয়ার বণিকরা তখন বাণিজ্য শুরু করেছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। এই বণিকদের একটা জাহাজে সামান্য কাজ নিয়ে কলম্বাস জেনোয়া থেকে পালালেন গোপনে। বয়স তখন তাঁর মাত্র পঁচিশ। জাহাজ জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে—এমন সময় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফরাসী জলদস্যুদের জাহাজ। জলপথ তখন ছিল দারুণ ভয়ের। আরব, ইংরাজ, ফরাসী—বিশেষ করে পর্তুগীজ জলদস্যুরা ছিল সমুদ্রপথের আতঙ্ক। এদের জাহাজের কালো পতাকায় সাদা রেখায় আঁকা থাকতো ক্রশ করা হাড়ের ওপর নরমুণ্ড। জলদস্যুদের কামানের গোলায় জেনোয়া বণিকদের জাহাজে আগুন ধরে গেল। শেষে ডুবেও গেল। কলম্বাস ভাঙা জাহাজের কাঠের মাস্তুল ধরে ভেসে এসে উঠলেন পর্তুগালের লা-গোস বন্দরের কাছে। সেখান থেকে এলেন লিসবন—পর্তুগালের রাজধানী। পর্তুগীজ নাবিকেরা দুর্ধর্ষ। তারা আটলান্টিক মহাসাগরের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আরবরা আটলান্টিক মহাসাগরের নাম দিয়েছিল 'অন্ধকার সাগর', কারণ এই মহাসাগরের সবই ছিল অজানা।

কলম্বাস পর্তুগালে বসবাস আরম্ভ করলেন। বিবাহ করলেন এক প্রবীণ নাবিকের কন্যাকে। শ্বশুরের কাছে পেলেন আটলান্টিক মহাসাগর অভিযানের ম্যাপ ও মূল্যবান বিবরণী। এসব বিবরণ পড়ে কলম্বাসের ধারণা হলো সমুদ্রপথে পশ্চিমদিকে জাহাজে যাত্রা করতে পারলে ভারতবর্ষ পৌঁছনো সম্ভব। ইউরোপে ভারতবর্ষের নাম ইন্ডিয়া। দরিদ্র ইউরোপীয় বণিকদের স্বপ্নের দেশ। সেখানে নাকি সোনা ছড়ানো আছে।

পর্তুগালের রাজা তখন দ্বিতীয় জন। কলম্বাস তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আপনি আমায় জাহাজ, নাবিক ও প্রয়োজনীয় অর্থ দিন। আমি আপনাকে ইন্ডিয়া যাওয়ার পথের সন্ধান দেব। রাজা জন বিশ্বাস করতে পারলেন না জেনোয়া থেকে আগত এই অজ্ঞাতকুলশীল ইতালীয়কে। বললেন, ছ'মাস পরে তুমি দেখা কর। ইতিমধ্যে তিনি গোপনে একটি জাহাজ পাঠালেন আটলান্টিক মহাসাগরে। তারা এদিক ওদিক ঘুরে এসে জানালো, কলম্বাসের পরিকল্পনা ভুল। এ পথে ইন্ডিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

কলম্বাস দেখলেন, পর্তুগীজ রাজা তাঁকে সাহায্য করবেন না। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ছ'বছরের ছেলে ডিয়ানোকে স্ত্রীর বোনের কাছে রেখে স্পেনের পথে যাত্রা করলেন। পকেটে টাকা নেই, মনে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলছে। কে দেবে তাঁকে সাহায্য—জাহাজ আর নাবিক? বয়স মাত্র চৌত্রিশ। দুঃখে, যন্ত্রণায়, হতাশায় মাথার চুলগুলো গেছে সাদা হয়ে। চেহারায় এসেছে রুক্ষ, রূঢ় ভাব। নীলাভ ছাই রঙা চোখে এক সুতীব্র চাহনি। স্পেনীয় ভাষা রপ্ত হয়নি। টান আছে ইতালীয় উচ্চারণের। কাজেই স্থানীয় লোকের কাছে ঠাট্টা তামাশার পাত্র।

স্পেনের অবস্থা তখন সুবিধার নয়। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে সে দেশ বিভক্ত। দক্ষিণ স্পেন তখন মূরদের অধিকারে। গ্রানাডায় তাদের আধিপত্য। আলহামরার স্থাপত্য মূরদের কীর্তি।

আরাগন রাজ্যের অধিপতি ফার্ডিন্যান্ড বিবাহ করেন কাসটাইল রাজ্যের রানী ইসাবেলাকে। এই দুই রাজ্যের মিলিত বাহিনী মহাশক্তিমান হয়ে ওঠে। কলম্বাস যখন স্পেনে এলেন তখন রাজা রানী মূর বিতাড়নে ব্যস্ত। কলম্বাসের আবেদন নাকচ হয়ে গেল। কলম্বাস সাত বছর ধরে অপেক্ষা করলেন। ১৪৯২ সালে মূর রাজ গ্রানাডা শহরের চাবি, আলহামরা দুর্গের অস্ত্রাগার রাজা ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। ইউরোপ থেকে ইসলামী অধিকার নিশ্চিহ্ন হলো। রাজা রানী নিশ্চিন্ত হলেন।

কলম্বাস এবার এক বিচিত্র আবেদন করলেন। রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলাকে জানালেন, তিনি ইন্ডিয়া যাবার জলপথ আবিষ্কার করবেন। তাঁকে দিতে হবে জাহাজ ও নাবিক। তাঁর উপাধি হবে এ্যাডমিরাল। আর যেসব ভূখণ্ড তিনি আবিষ্কার করবেন তার গভর্নর করতে হবে তাঁকে। যত হীরা, জহরৎ, সোনা, রূপা লুঠ করে পাওয়া যাবে তার এক-দশমাংশ তাঁকে দিতে হবে। রাজা ফার্ডিন্যান্ড দাবির বহর শুনে অবাক। হেসে উড়িয়ে দিলেন কলম্বাসের আবেদন। তবে রানী ইসাবেলা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাবিকের পরিকল্পনাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রাজাকে রাজী করালেন। কলম্বাসের আবেদন গৃহীত হলো। তারিখটা ১৪৯২ সালের ১৭ এপ্রিল।

সেদিন আগস্ট মাসের তিন তারিখ, শুক্রবার। খ্রীস্টানদের পুণ্যদিবস। খ্রীস্টের ক্রুশিফিকেশনের বার। তিনটি জাহাজ নীনা, পিন্টা, সান্টামেরিয়া স্পেনের রাজকীয় চিহ্ন আঁকা পতাকা উড়িয়ে আটলান্টিকে ভাসলো। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কলম্বাস বুকের উপর ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন দু'হাতে।

কলম্বাসের স্থির ধারণা তিনি চলেছেন ইন্ডিয়ার পথে। কলম্বাস

নাবিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়।

কিন্তু মূল আমেরিকা ভূখণ্ডে পৌঁছাননি। পৌঁছেছিলেন বাহামা দ্বীপে। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত স্থির বিশ্বাস ছিল যে তিনি সলোমনের স্বর্ণভাণ্ডারের দেশে পৌঁছেছেন। এটা এশিয়ার অংশ। অবশ্যই ইন্ডিয়া।

কলম্বাস ফিরে এলেন স্পেনে, সঙ্গে প্রচুর স্বর্ণসম্পদ। রাজা ফার্ডিন্যান্ড বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে কলম্বাস ও রাজা রাজপ্রাসাদে এলেন। স্পেনের সবচেয়ে বড় সম্মান 'ডন' উপাধিতে ভূষিত হলেন কলম্বাস। সামান্য পশম-তাঁতীর ছেলে হলেন দেশের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। যেখানে খ্যাতি, যেখানে যশ, সেখানেই ঈর্ষা আর বিদ্বেষ। স্পেনের রাজসভায় এক ইতালীয়ের প্রতিপত্তি একদল লোকের সহ্য হচ্ছিল না। তারা ষড়যন্ত্রের জাল পাতলো। রাজার কানে বিষ ঢালতে লাগলো।

এদিকে কলম্বাস আবার বেরিয়ে পড়লেন তাঁর নতুন আবিষ্কারের দেশের টানে। সে দেশের নাম হলো স্পেনের অনুকরণে এসপানোলা বা হিসপানিওলা। দ্বীপের উত্তর প্রান্তে আটলান্টিকের তীরে কলম্বাস গড়লেন রানীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় লা ইসাবেলা বন্দর।

কলম্বাস ভেবেছিলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের গোপন ভাণ্ডারে আছে সোনার পাহাড়। ঘোড়ায় চড়ে হাতে গাদা বন্দুক আর ইস্পাতের বর্শা তরবারি নিয়ে কলম্বাস ড্রাম বাজাতে বাজাতে গ্রামে ঢুকলেন। আদিম অধিবাসী তাইনোরা ভয় পেল। তারা ঘোড়া দেখেনি। গাদা বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভাবলো, এদের হাতে বাজ আছে, এরা দেবতা। আমেরিকার এই আদিম অধিবাসীদের কলম্বাস ভেবেছিলেন ইন্ডিয়ান। আজও আমেরিকার আদিম গোষ্ঠীর মানুষেরা রেড ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত। ভয় দেখিয়ে অত্যাচার চালিয়ে কিন্তু যথেষ্ট সোনা পাওয়া গেল না। তখন কলম্বাস আদেশ জারি করলেন চৌদ্দ বছরের বেশি বয়সের প্রত্যেক 'তাইনো ইন্ডিয়ান' তিন মাস অন্তর তিন আউন্স করে সোনা খাজনা দেবে তাঁকে।

জাহাজভর্তি সোনা পাঠালেন কলম্বাস স্পেনে। গোঁড়া খ্রীস্টান কলম্বাস চাইলেন স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের খ্রীস্টান করতে। তখনি বিদ্রোহ জেগে উঠলো তাইনোদের মধ্যে। তামার তৈরি অস্ত্র নিয়ে তারা কলম্বাসের গুদাম ঘর আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়।

এবার কলম্বাস স্পেন থেকে জাহাজে এনেছিলেন গাদা কামান। সেই কামানে বারুদ ঠেসে গোলা দাগা হতেই তাইনোরা জঙ্গলে পালাতে থাকে। স্বর্ণখনির অঞ্চলগুলো কলম্বাস দখল করে নেন। তাইনোদের কোতল করা শুরু হয়। মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে তাইনো ইন্ডিয়ানরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সংখ্যায় এরা দশ লাখের মতো ছিল।

কলম্বাসের পথ ধরে এসেছিল বর্বর স্পেনীয় দস্যু কর্টেজ আর পিজারো। কর্টেজ ধ্বংস করে সুপ্রাচীন মায়া সভ্যতা আর পিজারো বিনষ্ট করে ইনকা সভ্যতা। সোনার ভাণ্ডার স্পেনীয়রা লুঠ করে নিয়ে যায় স্পেনে। স্পেন হয়ে ওঠে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিমান ধনশালী দেশ।

কলম্বাসের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। মাত্র চার পাঁচ দিনের মধ্যে লা-ইসাবেলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নানা ধরনের রোগে মারা যায়। কলম্বাসের কর্মচারী ও নাবিক সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাদের অভিযোগ কলম্বাস তাদের প্রাপ্য সোনা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কলম্বাস হিসাবরক্ষক পিসাকে কারাগারে বন্দী করেন। আর দুজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। এসব খবর স্পেনে রাজা রানীর কাছে পৌঁছে যায়। আর ঠিক এই সময় জেনোয়া-যাত্রী এক জাহাজের নাবিকের কাছে পাওয়া যায় একটি পত্র। তাতে নাকি কলম্বাস লিখেছিলেন জেনোয়ার রাজার কাছে তিনি নতুন বিশ্বের অধিকার বিক্রি করতে চান।

খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাজা ফার্ডিন্যান্ড এক রাজকীয় যুদ্ধজাহাজ এসপানোলায় পাঠিয়ে দেন কলম্বাসকে বন্দী করে আনতে। কলম্বাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে জাহাজে তোলা হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন এক কালে কলম্বাসের অধীনে নাবিক ছিলেন।

তিনি কলম্বাসকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে চান। কিন্তু কলম্বাস রাজার ব্যবহারে মর্মাহত, অভিমান তখন তাঁর সারা অন্তর জুড়ে। স্পেনের জন্য তিনি জীবনপাত করলেন, এই কী তার প্রতিদান! তিনি জানালেন, হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায়ই তিনি স্পেনের বন্দরে নামবেন।

এদিকে রানী ইসাবেলা রাজাকে বোঝালেন, কলম্বাসের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কলম্বাস রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নন। এসব শত্রুদের ষড়যন্ত্র।

জাহাজ স্পেনে পৌঁছতে বন্দরে রাজার দূত এসে জানায় তিনি কলম্বাসকে ক্ষমা করেছেন। তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হোক। তবে কলম্বাসকে নতুন বিশ্বের গভর্নরের পদে আর রাখা হলো না।

মন ভেঙে গেল কলম্বাসের। এত বড় সাম্রাজ্য তিনি স্পেনের রাজাকে উপহার দিলেন, এই কি তার পুরস্কার! আড়াইশো বছর পরে ইংরেজকে ভারত সাম্রাজ্য জয় করে দিয়েছিলেন ক্লাইভ, প্রতিদানে পেয়েছিলেন অপমান, লাঞ্ছনা। আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়ান ক্লাইভ। অপমানিত কলম্বাস শেষবারের মতো তাঁর প্রিয় হিসপানিওলার উদ্দেশে জাহাজ ভাসান। ফিরে এলেন নিদারুণ অসুস্থ দেহ নিয়ে। ম্যালেরিয়া, টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। চোখে ঘা। উদরীর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। স্ট্রেচারে করে কলম্বাসকে বন্দরে নামানো হয়।

মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে দুরন্ত সমুদ্র অভিযাত্রীর জীবন শেষ হয়। তাঁর দেহ সেভিলের মঠে সমাহিত করা হয়। কিন্তু ১৫৪০ সালে তাঁর শবাধার স্পেন থেকে হিসপানিওলার সান্তা ডোমিগনো শহরে এনে সম্মানের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। সেখান থেকে আনা হয় হাভানায়, তারপর আবার ফিরে আসে সেভিলে। জীবনে যেমন মরণের পরেও এই দুরন্ত যাত্রীর পথপরিক্রমা ঘটেছে অনেকবার। ইতালীর জেনোয়া নগরীতে একটা পুরু কাচের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি গোলকের মধ্যে কলম্বাসের আবাসগৃহটি রক্ষিত আছে।

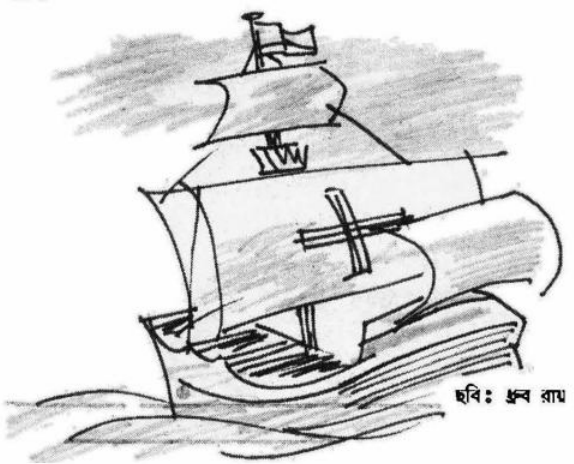

ছবি: ধ্রুব রায়

আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি ?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের
পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের
দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের
তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

হাঁদা-ভোঁদার

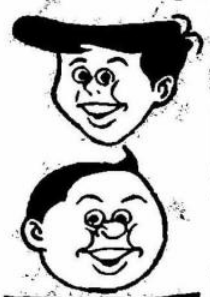

শিকারী কুকুর

তুই দারুণ কাজ করছিস, ভন্টা! বেশ খাবার শিকার করে আনছিস।
বাহ! আবার হাঁদা আর ওর কুকুর! ওরএই কুকুর দিয়ে খাবার চোরাই আর থোড়াই বরদাস্ত করবো!

পরে
একটা দুর্দান্ত প্ল্যান পেয়ে গেছি! এক ঢিলে দুজনে ঘায়েল হবে। এই বেকারির ছেলেটার কোমরে মাংস খণ্ডটা আটকে দি।

আমার প্ল্যান কাজ করেছে। মাংসখণ্ডটার দিকে ভন্টার নজর পড়েছে।

ইরক্!

থাম, পাজি বদমায়েশরা!

তুই আজ দারুণ হ্যাটট্রিক করেছিস, ভন্টা! প্রথমে চিকেন, তারপর কেক, এখন রোস্ট করে খাওয়ার জন্যে চমৎকার এক-খণ্ড মাংস!

গেলুম রে!
ঢুড়ুম!

হিঃ হিঃ! আমি ঐ মাংস খণ্ডে কিছু বিস্ফোরক গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম!
হতচ্ছাড়া বিটলে কুকুর আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

যমজ বোন

বরুণ দত্ত

রাণার মাসিমার ছেলে মেয়ে কেউ নেই। রাণাই তাঁর নয়নের মণি। আর সেই সুবাদে আমরা রাণার দু'তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও যথেষ্ট স্নেহ আদর নিমন্ত্রণ পাই রাণার মাসিমার কাছ থেকে।

মাসিমাদের বাড়ি আছে বিহার আর উড়িষ্যাতে—সব স্বাস্থ্যকর স্থানে। উত্তরবঙ্গে জমিজমা ছিল, এবার একটা বাড়িও কিনেছেন সেখানে। গরমের ছুটিতে সেই নতুন বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। মাসিমার সঙ্গে মায়েরও খুব ভাব হয়ে গেছে। ঠাকুমাও খুব স্নেহ-সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন মাসিমাকে। মাসিমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুমা বলেছেন, এমন ধনী ও রূপবতী অথচ এমন অমায়িক ভালো মানুষ দেখিনি।

যাই হোক আমরা বেড়াতে যাবার ব্যাপারে বাবার আপত্তি টিকল না। ঠাকুমাই আমার পক্ষ নিয়ে বলে দিয়েছেন—কি এমন জজ ম্যাজিস্ট্রেটের পড়া পড়ছে। সবে তো ক্লাস এইট। যাক, বেড়িয়ে আসুক। এরপরে উঁচু ক্লাসে উঠলেই বরং যেতে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া মেয়ে অমন করে বলে গেছে। মাসিমা তাঁর আন্তরিকতা দিয়ে ঠাকুমাকে এমন মুগ্ধ করেছেন যে ঠাকুমা তাঁকে মেয়েই বলেন।

নির্দিষ্ট দিনে দার্জিলিং মেল-এ আমরা রওনা হলাম। বেড়াতে

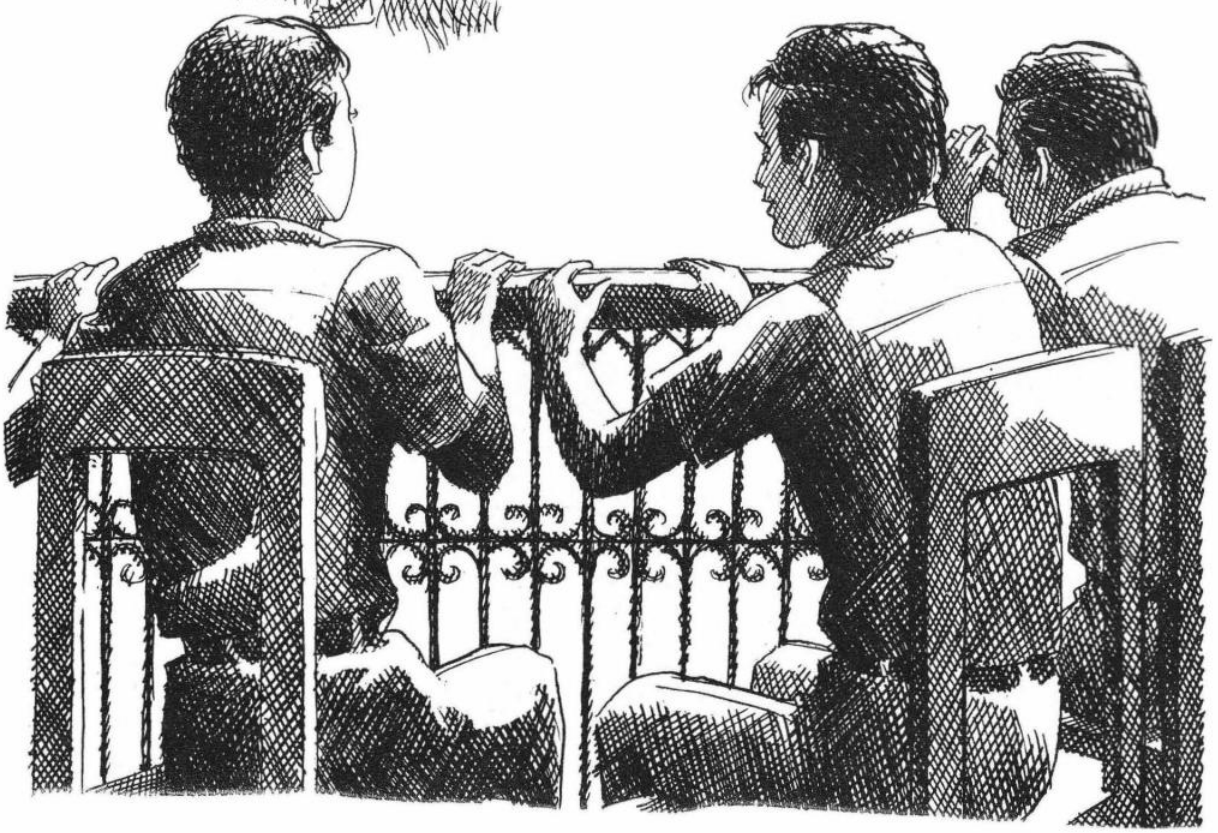

যাবার আনন্দে উত্তেজনায় সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না। পরদিন ভোরে নামা হলো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। তারপর জনবহুল রাস্তা ছেড়ে প্রায় মাইলটাক পথ এসে খোয়ামাটির রাস্তার উপরেই মাসিমাদের নতুন বাড়ি।

দোতলা, বেশ বড় বাড়ি, কিন্তু পুরনো। সঙ্গে আম, জাম, কাঁঠাল, কত রকমের লেবু, পেয়ারা, বেল, কমলালেবু, দুটো বড় স্বর্ণচাঁপার গাছ নিয়ে বিশাল বাগান। চাঁপাফুলের গন্ধ তো রয়েছেই সেই সঙ্গে আরও যেন একটা মিষ্টি কি গন্ধে সারাক্ষণ ম-ম করছে বাতাস। একটু দূরে একা একা দাঁড়িয়ে আছে একটা শিমূল গাছ। কলকাতার ছেলে আমরা এত বড় বাগান পেয়ে আত্মহারা।

এই বিশাল এলাকাসহ বাড়িটা নাকি মেসোমশাই কিনেছেন প্রায় জলের দামে। বাড়িটা অযত্নে অব্যবহারে পড়ে ছিল। তাই সারানো, রঙ করা ইত্যাদিতে অনেক খরচ হয়েছে। জল ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাও করেছেন নতুন করে।

এত সুন্দর বাড়ি, কিন্তু এ বাড়িতে কাজ করার লোক একটাও পাওয়া গেল না। অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার বলে হয়তো কেউ গরজ দেখাচ্ছে না। মাসিমার সঙ্গে সব সময়েই দুজন কাজের লোক, রাম আর বাসনা থাকে। এখানেও তারা এসেছে, তাই কোনো অসুবিধা হলো না।

নতুন বাড়িতে ঢোকা মানেই তো পুজোপাঠ খাওয়াদাওয়া। প্রয়োজনের চাইতে মাসিমার আয়োজন থাকে সব সময়েই বেশি। আজও তাই হয়েছে। অথচ অতিরিক্ত খাবারদাবার বিলিয়ে দেবার মতো গরীব মানুষও পাওয়া যাচ্ছে না।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে মেসোমশাই কি কাজে দার্জিলিং চলে গেলেন। ফিরে আসবেন আজই। আমরা কলকাতা ফেরার আগে যে দার্জিলিং যাবো, সে ব্যবস্থাও করে আসবেন। এটাও দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। কারণ খুব ছোটবেলায় মা বাবার সঙ্গে কবে দার্জিলিং এসেছিলাম, তা এখন আর মনে নেই।

সন্ধ্যার মুখে পাওয়ার কাট্ হলো। মাসিমার কাজের লোক রাম পেট্রোম্যাক্স জ্বেলে ফেলল, বাসনা জ্বালল দুটো বড় হ্যারিকেন। একটা রেখে এল সিঁড়ির মুখে। অন্যটা ড্রইংরুমে। পেট্রোম্যাক্স থাকল ঠাকুরঘরের সামনে। মেসোমশাই আগেই বলেছিলেন জেনারেটরের কথা, মাসিমাই বারণ করেছেন। বলেছেন, পরের বার একটা কিনে নিও। এই কটা দিনের জন্য আর এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

মাসিমা ঠিক কথাই বলেছেন, পরে লাগবেই। কারণ মেসোমশাই তাঁর এরিয়া অফিস করবেন এই বাড়িটা ভবিষ্যতে।

বাড়িতে এখন আমি, রাণা, সৌরভ—তিন বন্ধু, মাসিমা আর তাঁর রাম ও বাসনা। এরই মধ্যে বাড়ির সব কটা আলোই একসঙ্গে হঠাৎ টুপ করে নিভে গেল। আমরা অন্ধকারে ডুবে গেলাম যেন। মাসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, ও রাম, দেখ তো আলোগুলোয় তেলটেল আছে কিনা। তোরা একটা কাজও ঠিক করে করতে পারিস না। বাবুর ঘরের বড় টর্চটা নিয়ে আয় চটপট। আলোগুলোর সঙ্গে কটা বড় মোমবাতিও জ্বেলে দিস। প্রথম দিনেই দেখ তো কী অবস্থা!

রাম আর বাসনা ব্যস্তহাতে আলোগুলো ফের জ্বেলে ফেলল। সেই সঙ্গে ইয়াব্বড় তিন চারটে মোমবাতিও। তারপর রাম বলল, মা তেল তো সব বাতিতেই ভরাভর্তি রয়েছে।

মাসিমা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়েছিলেন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো প্রদীপটা কে যেন তুলে নিয়ে গেছে। মাসিমা বিরক্ত হয়ে ভাবলেন এ নিশ্চয়ই বাসনার কাজ। হাতের কাছে দেশলাই না পেয়ে ঐটাই তুলে নিয়েছে। কিন্তু ফিরিয়ে দেবে তো। যতসব অলক্ষুণে কাজকর্ম। ঠাকুরঘর অন্ধকার করে কেউ প্রদীপ নেয়। বিরক্ত কণ্ঠে তাই ডাকলেন, বাসনা, বাসনা?

মাসিমার ডাকে বাসনা রান্নাঘর থেকে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো, বলল, কি বলছো মা?

কি বলছি? প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি?

আমি প্রদীপ নিয়েছি! কি যে তুমি বল না মা! তখনই বলেছিলুম, এই শরীলে তুমি এত ধকল নিওনি, কি দেখতে কি দেখছ!

মাসিমা একটু থতমত খেয়ে বললেন, নে আর খবরদারি করতে হবে না, প্রদীপটা কোথায় রেখে এলি তাই দেখ।

ঐ তো পিলসুজের উপরেই রয়েছে মা। বলতে বলতে বাসনা চলে গেল।

বাসনার কথা অবশ্য মিথ্যে নয়, কাজের লোক না পাওয়ায় মাসিমার পরিশ্রম হয়েছে খুবই। না হয়েছে বিশ্রাম, না হয়েছে সময়মতো খাওয়াদাওয়া। ভুল তো তাঁর হতেই পারে।

আমরা তিনবন্ধু বাগানের দিকের দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। মাসিমা, বাসনা ও রামের কথোপকথন কমবেশি শুনেছি, যদিও আমাদের দৃষ্টি ছিল আধো জ্যোৎস্নামাখা বাগানের দিকে। ভারী সুন্দর দুটি মেয়ে, হয়তো আমাদের মতোই বয়স হবে অনেকক্ষণ থেকে চাঁপাগাছের ওদিকটায় খেলা করছিল। এখন তাদের দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কি দুষ্টু আর সাহসী মেয়েরে বাবা। কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তবু বাড়ি ফেরার নাম নেই। ওদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

একটু পরে পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারিদিক। শুনেছি এখান থেকে নাকি এমন জ্যোৎস্নারাতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যায়। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না! কি জানি হয়তো তিন চারতলা বাড়ির ছাদে উঠলে দেখা যায়।

এতক্ষণে কারেন্ট ফিরে এলো। এবার আমরা ঠিক করলাম ছাদে উঠে নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষার শোভিত শৃঙ্গগুলো দেখার চেষ্টা করব।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম সেই মেয়ে দুটি ছাদ থেকেই নেমে আসছে। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া। রাণা গেছে রামের কাছ থেকে চাবিটা আনতে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব—ওরা ওপরে কি করছিল, না মেয়ে দুটি আমাদের ধাক্কা দিয়েই নিচে

নেমে গেল। আর তক্ষুণি রাণাও চাবি নিয়ে দৌড়ে এল। বলল—কি জোর একটা হাওয়া বইল রে! ছাদে আর গিয়ে কাজ নেই, বৃষ্টি আসতে পারে।

ছাদে যাওয়ার গরজ কারুরই আর থাকল না। বসার ঘরে চলে এলাম তিনজনে।

ওদিকে মাসিমা রান্নায় ব্যস্ত টের পাচ্ছি। বাসনা মাসিমার হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে। রামের বিছানাপত্র রেডি করছে। এক ঘরে শোব আমরা তিনবন্ধু একই খাটে, সেই ঘরের মেঝেতে একপাশে রামের বিছানা। অন্যঘরে মাসিমা আর তাঁর বাসনা। মেসোমশাইয়ের ঘর আলাদা।

মাসিমা একপ্লেট ফিস ফ্রাই নিয়ে এলেন, বললেন, খেয়ে দেখো কেমন হলো? এখন আর বেশি খেয়ে কাজ নেই। তোমাদের মেসোমশাই এলে খেতে দিয়ে দেবো, নাকি আগে খাবে?

না না, মেসোমশাই ফিরে এলে একসঙ্গে খাবো, দার্জিলিংয়ের গল্প শুনতে শুনতে। আমরা প্রায় একই সুরে বলে উঠলাম তিনজনেই।

বেশ, তবে তাই হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে? ভারী মিষ্টি মেয়ে দুটি। কি লাজুক!

মাসিমার কথায় আমরা মাথা নাড়লাম, হয়নি। রাণা বলল, বাগানে ওদের আমরা দেখেছি।

মাসিমা নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের সবারই কেমন যেন একটা গা-ভারি অবস্থা, সবাই সবাইয়ের গা ঘেঁষে বসতে চাইছি। কেন এমন হচ্ছে! গাছগাছালির মধ্যে এতবড় বাড়িতে মাত্র এই কজন লোক বলে হয়তো এমন একটা ভাব হতেও পারে।

পরে জানতে পারি আমাদের চোখ এড়িয়ে মেয়ে দুটো কখন মাসিমার কাছে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাসিমা ওদের দুখানা থালায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন প্রসাদ মিষ্টি পায়েস। কিন্তু এত লাজুক যে মাসিমার সামনে খেতে বসছিলই না। মাসিমা তাই হেসে ওখান থেকে সরে এসেছিলেন যাতে ওরা ভালো করে খেতে পারে। বাসনাকে বলেছিলেন, বাসনা যা তো, বলে আয় ওরা যেন যাবার সময় দেখা করে যায়।

বাসনার খুব ভুলো মন। সে তক্ষুণিই ঠাকুরঘরে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়ে দুটিকে দেখতে পায়নি। মাসিমাকে সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। কাজের ব্যস্ততায় ব্যাপারটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল। ঠিক এরকম সময় মেসোমশাই ফিরে এসেছিলেন আর আমরা দার্জিলিংয়ের গল্পে কথায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম।

মাসিমা যে একা হাতে কত রান্না করেছেন! কোনটা ফেলে কোনটা খাই!

ওদের দুখানা থালায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

খেতে দিতে দিতেও মাসিমা বার দুয়েক বললেন মেয়ে দুটির কথা। মেসোমশাইকে বললেন, কালই মেয়ে দুটির মা-বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে হবে। হাজার হোক প্রতিবেশী তো।

আমরা তিনবন্ধু নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ভাবলাম মাসিমার পুষ্যি বাড়ল আর কী। একটু হিংসেও যে হলো না মনে মনে তা নয়। তবে ভালও লাগল, ভরী সুন্দর পরী পরী দেখতে। বোধহয় যমজ বোন । যদি বন্ধুত্ব হয় ভালই।

প্রথম দিন খাওয়াদাওয়া চুকতে বেশ রাতই হয়ে গেল। সবাই যে যার ঘরে ঢুকলাম নিশ্চিন্ত ঘুমের আশায়। কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারলাম না। প্রথমে মনে হলো যেন বাড়িতে অনেক লোক ঢুকে পড়েছে, দুপদাপ পায়ের শব্দ। রাম তো 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়েই উঠেছিল। মাসিমা মেসোমশাইকে আমরা ডেকে সব বললাম। সারা বাড়ির সব আলোগুলো জ্বালা হলো, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো চারদিক—কেউ কোথাও নেই। দরজা জানালার ছিটকিনি, খিল, চাবি সব ঠিক আছে।

মেসোমশাই মাসিমাকে বললেন, খাটাখাটনি করে রাম বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নটপ্ন দেখে থাকবে। কোথায় কি! চল শুয়ে পড়া যাক।

মাঝরাত পেরিয়ে আবার ঘটল একই ঘটনা। এবার শুধুমাত্র ঠাকুরঘরের দিকেই। আবার সব পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হলো কোথাও কিছু নেই। মাসিমা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বাসনাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন আমাদের ঘরে। মেসোমশাইকেও বাধ্য করলেন আমাদের ঘরে শুতে। একটা কেমন গা-ছমছম ভাব, একটু একটু করে সবাই তবু ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙল সারাবাড়ি জুড়ে দাপাদাপির আওয়াজে। তারপর কখনো দরজা খোলার শব্দ, কখনো পাতকুয়োয় বালতি ফেলে জল তোলার আওয়াজ হতে থাকল। সবাই জেগে উঠেছে, ঘরে হলঘরে আলো জ্বলছে। কি যে করা যায়, করা উচিত আমরা কেউই ভেবে পাচ্ছি না। হাতের কাছে একটা ছোট লাঠি রেখে মেসোমশাই জেগে বসে রইলেন। রামের তো ভয়ে মুখ কালো, বাসনার মুখ ফ্যাকাসে, মাসিমা গুরুর নাম করছেন। আকাশটাও থমথম করছে মেঘে, বৃষ্টি আসবে নিশ্চয়ই। বাতাসে বেশ ঠাণ্ডার আমেজ।

কখন দুচোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। আচমকা মাথার বালিশটা কেউ টেনে নিতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি সৌরভ আর রাণা একে অপরের দিকে উল্টো মাথা করে শুয়ে আছে। ওদের মাথায়ও বালিশ নেই। এ কি রে বাবা! আমাদের বালিশগুলো গেল কোথায়? যেই না এই কথা ভাবা, অমনি সেই মেয়ে দুটো খাটের পাশে উঁকি দিয়ে হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখছি নাকি! তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে তাকাতেই দেখি কেউ নেই! তক্ষুণি আবার সেই দুপদাপ শব্দ। এবার ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। রান্নাঘরে কারা যেন বাসনপত্র এলোপাথাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছে। একটু পরে সব শান্ত হয়ে গেল।

মেসোমশাই বললেন, তোমরা শুয়ে পড়। আমি তো জেগেই আছি। রাম বরং টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে থাক।

পরদিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। দিনের আলোতে কাল সন্ধ্যে থেকে প্রায় সারারাত যে তাণ্ডব গেছে বাড়ির উপর দিয়ে তা সবই যেন স্বপ্ন বলে মনে হলো। মাসিমা মেসোমশাইয়ের চোখেমুখেও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছাপ। দুশ্চিন্তাগ্রস্তও বটে।

আমরা তিনবন্ধু ব্রেকফাস্ট করছি এমন সময় মেসোমশাইয়ের এক বন্ধু এলেন। তাঁকে চা দিয়ে মাসিমা মেসোমশাই তাঁর সঙ্গে নিচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

হঠাৎ শুনতে পেলাম ভদ্রলোক বলছেন, বাড়ি কিনছ বলেছিলে। কোথায় কিনছ, কি বৃত্তান্ত তা তুমিও বলনি। আমিও ব্যস্ততার মধ্যে জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলে, পেয়েছো, ব্যস। কিন্তু এই বাড়ির ব্যাপার জানলে নিশ্চয়ই বারণ করতাম।

কথাটা শুনে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। একটা গা-ছমছম ভাব যেন ঘিরে ধরল। এই দিনের বেলায়ই একঘরে বন্ধুরা একসঙ্গে থেকেও খালি মনে হচ্ছে, কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা শুধু আমার একার নয়, বাড়িসুদ্ধু সবার।

তারপর শুনলাম, আজ বিকেলেই তিনটে নাগাদ আমরা দার্জিলিং রওনা হব। শুনে মানসিক চাপটা কিছুটা হাল্কা হলো। তবু চলছি ফিরছি, মনে হচ্ছে যে কারুর সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগছে। পাছে বন্ধুরা আমাকে ভীতু ভাবে, তাই মনের কথা প্রকাশ করছি না। আর কতক্ষণই বা আছি এ বাড়িতে। রাণাকে দেখলাম সারাক্ষণই রামকে ছুঁয়ে আছে।

দুপুরে আমরা তিনবন্ধু আর মেসোমশাই এক টেবিলের চারদিকে খেতে বসেছি। হঠাৎ টেবিলটা খুব জোরে নড়ে উঠল। যেন ভূমিকম্প হলো। গ্লাস থেকে জল চলকে পড়ল। মাসিমার মুখ চিন্তায় কালো। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখে যেন কিছু একটা ভাব বিনিময় হলো।

গোছগাছ শেষ। বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল একটা স্টেশন ওয়াগন। সবাই চড়ে বসলাম। সকলের হাতেই একটা করে গরম পোশাক। ঘণ্টা দেড়েক পরেই, অর্থাৎ কার্শিয়াং থেকেই তো গায়ে চাপাতে হবে।

মেসোমশাই আর তাঁর বন্ধু সব বন্ধটন্ধ করে এলেন। অনেকক্ষণ সময় লাগল ওঁদের। কি জানি কেন।

গাড়ি চলছে। আমরা সবাই নীরব। সব চাইতে বেশি মনমরা অবস্থা মাসিমার। এক একবার আমাদের এক একজনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন যেন এক পরম নিশ্চিন্ততায়।

এক সময় আমরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে শুকনা ফরেস্টের দিকে এগিয়ে চললাম। মাসিমার একটু বোধহয় তন্দ্রা মতন এসেছে। কাল সারা দিনরাত যা ধকল শরীরে আর মনের উপর দিয়ে গেছে ওঁর!

মাসিমার কান বাঁচিয়ে রাণা বলল, রামের কাছে আমি সব শুনেছি। আমরা খুব বেঁচে গেছি। ওটা ভূতের বাড়ি। ওই দুই যমজ বোনকে ডাকাতরা মেরে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিল। ওখানে আর ফিরব না আমরা। দার্জিলিং থেকে সোজা কলকাতা।

ছবি: মদন সরকার

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বন্ধু মিলনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেষ্টায় কিছু সময় এখন দিতে হলো টারজানকে। সেটা প্রাতঃভোজনের যোগাড়। এ বনে হরিণ তো পর্যাপ্ত সংখ্যাতেই আছে নিশ্চয়। যত শীঘ্র হয়, একটাকে শিকার করে, উদরস্থ করে আবার–

এই যে একটা হরিণের গায়ের গন্ধ। একটার নয়, বহু হরিণের। আহা, এ যোগাযোগ তো মন্দ নয়। এক জায়গাতেই বারার (হরিণের) ও ন্যুমার গন্ধ। দুটো জিনিস হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরছে ফিরছে, ওলটপালট খাচ্ছে। এর অর্থ?

এর অর্থ, হরিণের পাল আগে থেকেই ছিল এখানে। ন্যুমার উপস্থিতির আভাস পেয়েই পালিয়েছে এবং পরক্ষণেই ন্যুমা এসে ধাবিত হয়েছে তাদের পিছনে। যাহোক, হরিণের সন্ধান পাওয়া গেল, এটাই মস্ত লাভ। টারজানের কাছে এখন বন্ধু দর্শনের উপরেও অধিকতর কাম্য দাঁড়িয়েছে হরিণ দর্শন।

কিন্তু আচমকা, এ কী? নানা কণ্ঠের ভয়ার্ত একটা অট্রোল যে? তার ভিতর বহু হরিণের ডাক আর একটা ক্রুদ্ধ ন্যুমার আকাশফাটানো হুঙ্কার একত্র মিশে আছে। তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, সেই ঐকতানের মধ্যে টারজান শুনতে পেয়েছে, বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ আর আহত অশ্বের মরণ যাতনার চীৎকার।

এবারে আর গন্ধ শুঁকে শুঁকে পায়ে পায়ে এগুবার দরকার নেই। যার খোঁজ সে করছে সারা রাত, সে ঐ সমুখে। নিজের খাদ্যের সংস্থান, হারানো সিংহবন্ধুর পাত্তা, সব একসঙ্গে। উপরন্তু যার কথা সে চিন্তাও করেনি, সেই অপ্রত্যাশিত বস্তুও একটা। অর্থাৎ অশ্বসমেত অশ্বারোহী একজন। সিংহ যাচ্ছিল হরিণ মারতে, মাঝখান থেকে পেয়ে গেল ঘোড়া। ভালই লাগবে তার, মুখ বদলাতে পারবে।

এখানে আকাশশূন্য পথ নেই। পায়েই হেঁটে যাচ্ছে টারজান। সে হাঁটা অবশ্য অন্য যে কোনো লোকের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়েরই মতো দ্রুত। মনটাতে উত্তেজনা এসেছে আবার। ঐ ঘোড়ার চীৎকারের দরুন। অশ্বারোহী সৈনিকের যাতায়াত এ পথে তো হতেই পারে আজকাল। জায়গাটাকে স্বচ্ছন্দে বলা যায় নো ম্যানস ল্যান্ড, বেওয়ারিশ এলাকা। ওদিকটাতে ইংরেজ শিবির, এদিকে পাকাপোক্ত জার্মান অধিকার। সৈন্যচলাচল অবশ্য সর্বদা হয় না, তবু চলতে ফিরতে হয় সংবাদবাহী সৈনিকদের এবং সংবাদসন্ধানী গুপ্তচরদের। ঐ যে লোকটার ভয়ার্ত চীৎকার শোনা গেল এইমাত্র, সে এর মধ্যে কোন শ্রেণীতে পড়বে, এইটাই বর্তমানের প্রশ্ন। সংবাদবাহী হলে জার্মান, চর হলে সম্ভবতঃ ইংরেজ। এবং ইংরেজ যদি হয়, তা হলে সম্ভবতঃ সে গত সন্ধ্যার পরিখা-যুদ্ধটার কথা জানে না এখনও। দেখা যাক, ঐ তো আবারও শোনা

যায় মানুষটার চ্যাঁচামেচি, ঘোড়াটা সম্ভবতঃ অক্কা পেয়ে থাকবে ইতিমধ্যে। আর হরিণের পাল? ঐটাই বড় নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালো টারজানের পক্ষে। হরিণের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সিংহে-মানুষে লড়াই বাধল যখন, তখন হরিণেরা পেলো পালাবার সুযোগ। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে ওরা?

এসে পড়েছে টারজান। না, ডাইনে বাঁয়ে সমুখ পানে হরিণের লেজও চোখে পড়ে না একটাও। যা পড়ে চোখে তা হলো একটা ধরাশায়ী অশ্ব, আর সেই অশ্বের কাঁধে বিজয়ীর গর্বে সমাসীন এক নুম্যা মহারাজ। টারজানেরই সেই হারানিধি ন্যুমা। ভোজনের স্বর্গীয় আনন্দে তার চোখ বোজা, তা না হলে তার লাঙ্গুলের প্রান্তেই একটা মানুষ যে নৈরাশ্যে, আতঙ্কে, মরার আগেই মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে, হারানিধির সে খেয়াল নেই।

হ্যাঁ, একটা মানুষ! এই মানুষটারই চীৎকার টারজান শুনতে পেয়েছিল একটু আগে। এখন আর সে চ্যাঁচাচ্ছে না। হয়তো সে ভাবছে, 'মরেই তো গেছি, আর এখন চৌঁচিয়ে কী হবে?'

চ্যাঁচাচ্ছে না, সর্বশক্তি দিয়ে তার পা-খানা উদ্ধার করার চেষ্টা করছে ঘোড়ার পিঠের নিচে থেকে। সিংহটা আক্রমণ করল একান্ত হঠাৎ। তার উপস্থিতির কণামাত্র আভাস আগে থাকতে পেতো যদি, মানুষটা সময় পেতো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়তে। সিংহ ছিল ঘোড়ার ডাইনে, মানুষটা যদি দাঁড়াতে পারত তার বাঁয়ে, ঘোড়ার দেহের আড়াল থেকেই সে পিস্তল ছুঁড়তে পারত সিংহকে লক্ষ্য করে। অবশ্য তার পকেটের ক্ষুদ্র পিস্তলের গুলিতে ঐ কালাপাহাড় সিংহের চামড়াও ফুটো হতো কিনা, বলা যায় না। তবু দৈবাৎ গুলিটা আততায়ী দুশমনের চোখে লাগত যদি, ভয় পেয়ে সে শিকারের চেষ্টা ছেড়ে, লেজ গুটিয়ে পালাতেও তো পারত।

না, সে সুযোগ তাকে দেয়নি হারানিধি। আচমকা এক হুঙ্কার, যা শুনলে মানুষের বা ঘোড়ার সম্বিৎ হারিয়ে ফেলারই কথা। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক লম্ফ, যার সঙ্গে উপমা দেবার জিনিস একটিই আছে, নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল লোকটা। হঠাৎ সে চোখে দেখল ধোঁয়া, তার কানে লাগল তালা, তার মাথাটা বোঁ করে গেল ঘুরে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে আবিষ্কার করল তার নিজেরই ঘোড়ার পিঠের তলায় চাপা অবস্থায় ধরাশয্যায়। চাপা অবশ্য গোটা দেহটাই পড়েনি তার, পড়েছে বাঁ পা-খানা। কিন্তু এমন গুরুভার ঐ ঘোড়াটার (না কি সিংহটার দেহভারও আধাআধি যোগ হয়েছে ঘোড়ার ভারের সঙ্গে?) আপ্রাণ চেষ্টাতেও লোকটা বিন্দুমাত্র সরাতেও পারছে না সেই দেহ, এক ইঞ্চিও টেনে বার করতে পারছে না তার বন্দী বাঁ পা-খানা।

বেশি নাড়াচাড়া করতে, ধাক্কাধুক্কি মারতে সাহসও হয় না। সিংহ এখন চক্ষু বুজে চর্বণের আনন্দ উপভোগ করছে। তাতে কেউ বিঘ্ন ঘটালে হয়তো পশুরাজের ক্রোধের কারণ হয়ে পড়তে

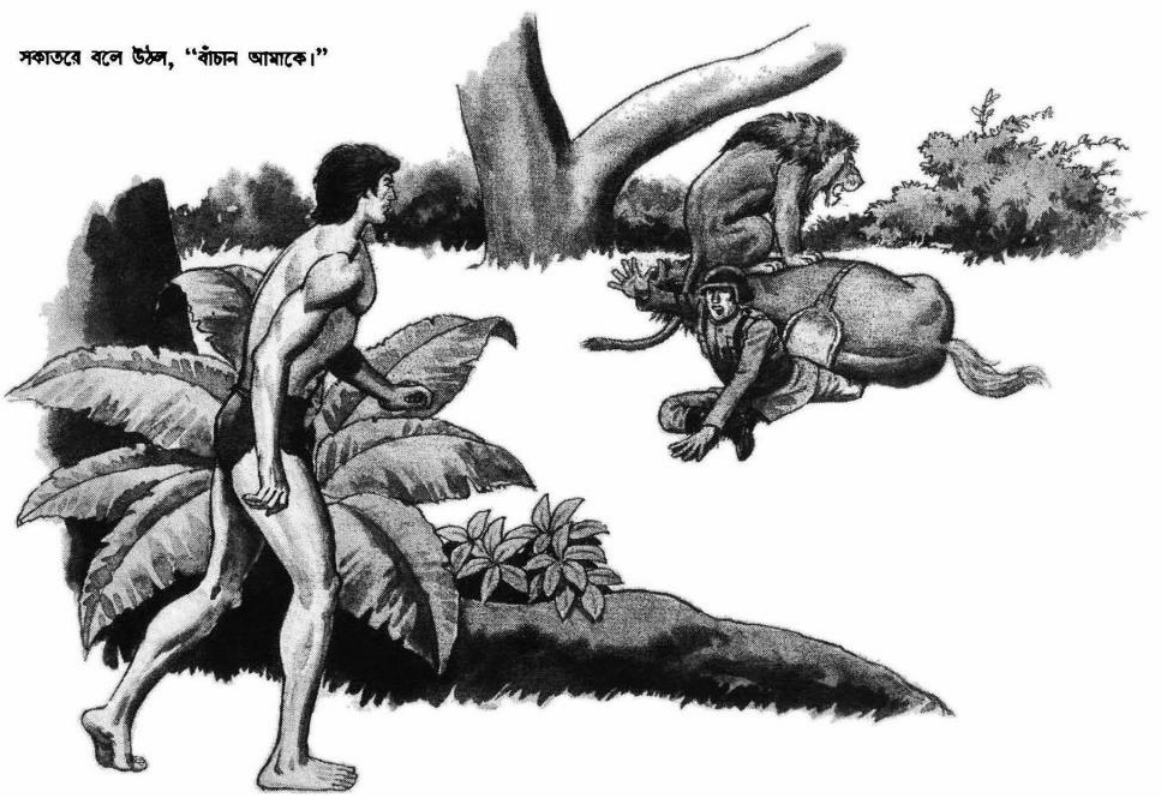

সকাতরে বলে উঠল, "বাঁচান আমাকে।"

পারে সেটা। আর তা যদি হয়ে পড়ে, সে ক্রোধের ফল তো ধরাশায়ী মানুষটাকেই ভোগ করতে হবে।

এই যখন অবস্থা, তখনই টারজানের আবির্ভাব ঘটল এই সংকটসংকুল ঘটনাস্থলে। টারজান দূর থেকেই চিনতে পেরেছে হারানিধিকে। কিন্তু তার দরুন বিশেষ ভরসা পায়নি অন্তরে। সিংহটার জঠর এখন শূন্য থাকারই সম্ভাবনা। আর শূন্যই যদি হয় জঠর, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যা হারানিধিকে অপসারিত করে আনতে পারে ঘোড়ার কাঁধ থেকে।

আর হারানিধি আপন ইচ্ছায় সরে না গেলে, ভূপতিত মানুষটার উদ্ধারের উপায় কী? টারজান যদি গায়ের জোরে সেই চেষ্টা করতে যায়, হারানিধি সে বেয়াদবি সহ্য করবে কী? সত্য বটে, গত কয়েক দিন একত্র চলাফেরা করেছে টারজান আর হারানিধি, কয়েক দফায় পেট ভরে ওকে খাইয়েও দিয়েছে টারজান, কিন্তু তার দরুন টারজানকে খুব বেশি খাতির কি আর করবে হারানিধি? এ তো টারজান ভালই জানে যে খাওয়ার বিঘ্ন যে করে, সিংহেরা আগে তাকেই খায়।

টারজান দাঁড়িয়ে পড়েছে কর্তব্য স্থির করবার জন্য, এমন সময় লোকটা সকাতরে বলে উঠল, "বাঁচান আমাকে।" কথাটা কানে যেতেই এই প্রথম টারজান লোকটার মুখের পানে তাকালো। আর অমনি তার স্মৃতির কোঠায় একটা আঁধারে-ঢাকা অংশ সহসা যেন বিদ্যুতের আলোকে ঝলস উঠল। এ লোককে আগেও দুই দুইবার দেখেছে টারজান। গতরাত্রেই ইংরেজ সেনাশিবিরের নিকটে অরণ্যে, লাইটারের আলোতে সিগারেট জ্বালানোর কালে একবার, আর তারও আগে, বেশ কয়েক দিন আগে, জার্মান শিবিরে। মুয়েরবার্নককে ধরে নিয়ে আসার অব্যবহিত পূর্বে।

কর্নেল আন্দ্রেকার এর নাম বলেছিলেন মিচেলস্। তাঁর কথা থেকে টারজান এই বুঝেছিল যে মিচেলস্ গুপ্তচর জার্মান বাহিনীর। টারজান কি তাহলে এখন একটা বুভুক্ষু সিংহকে ঘাঁটাতে যাবে, এই জার্মান গুপ্তচরকে বাঁচাবার জন্যে? সেটা কি দেশদ্রোহিতারই কাজ হবে না?

এ তো বিষম সংকটে পড়ে গেল টারজান।

সংকট বলতে টারজান চিরদিনই বুঝেছে দৈহিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি। আজকের এ ব্যাপারের সঙ্গে কিন্তু তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন মোটেই জড়িত নয়। হারানিধি এখনও অশ্বশির চর্বণে নিরত। টারজানকে সে এ-যাবৎ লক্ষ্যই করেনি। অশ্বমস্তক নিঃশেষে গলাধঃকরণ না করে সে যে তা করবেও না, এটা তার হাবভাব থেকেই বেশ বোঝা যায়। টারজান ইত্যবসরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে গিয়ে নিকটতম কোনো বৃহৎ বনস্পতির তেতলায় উঠে পড়তে পারে। আর সেখানে বসে অশ্ব-সিংহ-গুপ্তচরাখ্যেয় বিয়োগান্ত নাটকের পরবর্তী অঙ্ক পর্যবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

পারে হয়তো তা। কর্তব্যনির্ণয়ের সমস্যা এই ভাবেই সে অতি সহজে পারে সমাধান করে ফেলতে। সংকট বলতে তাহলে কিছুই থাকে না তার। কিন্তু সেই যে কিছুই থাকে না বস্তু, সেটা হলো টারজানের দৈহিক সংকট। সেটা এখনও কিছু নেই, পরেও থাকবে না কিছু। কিন্তু সেটা ছাড়াও সংকট তো মানুষের সম্মুখে অন্য আকারেও আসতে পারে। যেন, নৈতিক সংকট। আজকের এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে পড়েছে টারজান, তাকে নিঃসংকোচে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে নৈতিক সংকট।

একটা মানুষ মৃত্যুর মুখে। সে সকাতরে প্রার্থনা করেছে এই দুর্মদ টারজানের কাছে "বাঁচান! আমায় বাঁচান!" এ কথা টারজান অস্বীকার করতে পারবে না যে বাঁচানোর ক্ষমতা তার পুরোমাত্রাই আছে। এমন কত সিংহের সঙ্গেই তো হাতাহাতি লড়াই তার হচ্ছে প্রতিদিন। সিংহগুলোই মরেছে, টারজানের লোহার শরীরে দুই একটা তুচ্ছ আঁচোড়-পাঁচোড় ছাড়া কিছুই লাগেনি। তবে?

আপন নিরাপত্তার প্রশ্নকে বড় করে দেখা টারজানের স্বভাব নয় কোনোদিন। তবে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে সে তা করতে যাবে কেন? করে যদি, তাহলে বুঝতে হবে, নিরাপত্তা নয়, অন্য কোনো হেতু আছে এই শত্রুজাতির গুপ্তচরটার প্রাণরক্ষা ব্যাপারে টারজানের সুস্পষ্ট ঔদাসীন্যের।

সে হেতুটা যে কী, তাও কি আর দুর্বোধ্য নাকি? হেতু এই যে লোকটা শত্রু জাতিরই চর, নিজের জাতির নয়। চরবৃত্তিটাকে বৃত্তি হিসাবে নিন্দনীয় বলবে না কেউ। কারণ যুদ্ধের সময়ে তো বটেই, শান্তির সময়েও একটা বিশাল চরবাহিনী সভ্যতম উন্নততম জাতিসমূহকেও পুষতে হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, যে কোনো রকম সাফল্য যদি অর্জন করতে হয় যে কোনো দেশের প্রশাসনকে পর্যাপ্তসংখ্যক সুদক্ষ গুপ্তচর তাকে রাখতেই হবে মোটা মাইনে দিয়ে। তাহলে কী অধিকার আছে টারজানের যে সে ঘৃণা করবে এই জার্মান লোকটাকে? জাত্যংশে জার্মান হওয়া কি একটা অপরাধ নাকি? অন্য জাতিতে যেমন ভূরি ভূরি মহাপ্রাণ মনস্বীর আবির্ভাব হয়েছে যুগে যুগে, জার্মান জাতির মাঝেও হয়েছে তেমনি। তবে?

হঠাৎ এই জটিল প্রশ্নের উচিত জবাব দিতে পারে এমন দার্শনিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা টারজানের নেই। তারই জন্য আজ এই সংকট তার। কোন জিনিসটাকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবে সে? জাতীয়তাকে? না, মানবতাকে? কোনটা ঠিক তা টারজানকে বলে দেবে কে?

বলে কেউ দেয়নি এ যাবৎ; আজ ঐ জার্মান লোকটির জীবন-সংশয়ের ক্ষণে কেউ আসছেও না বলে দিতে। তাহলে? কী এখন কর্তব্য তার?

(চলবে)

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

গ্যাস-ট্রাক্সি

গ্যাস দিয়ে ট্যাক্সি চলবে! সে কি করে হয়? গ্যাস ভরে তো বেলুন ওড়ানো হয়। রান্নাঘরেও গ্যাস জ্বালানো হয়। অসুস্থ মানুষকে অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হয়। ট্যাক্সি চলে তো পেট্রল বা ডিজেল দিয়ে। সেজন্য এগুলোর দামও বাড়ছে ফি বছর। আবার ব্যবহার করতে করতে এগুলো পৃথিবী থেকে খুব তাড়াতাড়ি, হয়তো বা আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তখন কি হবে? এসব কথা ভেবেই বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন গ্যাস-ট্যাক্সি, যা চলবে সি. এন. জি বা কমপ্রেস্‌ড ন্যাচারাল গ্যাস দিয়ে। জুন ১৯৯৩ নাগাদ বোম্বাইয়ের অর্ধেকের বেশি ট্যাক্সি চলবে সি. এন. জি. দিয়ে। আর এতে খরচও পড়বে কম। কারণ এক লিটার পেট্রলের দাম যেখানে প্রায় ১৭ টাকা সেখানে এক লিটার সি. এন. জি.র দাম মাত্র আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা। অথচ দুটির একই পরিমাণ ব্যবহারে সমান দূরত্ব যাওয়া যায়, ফলে ট্যাক্সি ভাড়া অনেক কমে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই গ্যাস-ট্যাক্সি কিন্তু ডিজেল বা পেট্রল চালিত ট্যাক্সির মতো পরিবেশকে অত দূষিত করে না। আমাদের কলকাতায় কিন্তু গ্যাস-ট্যাক্সি চলার আশা খুব কম। কারণ এখানে বেশির ভাগ ট্যাক্সি চলে ডিজেলে। যার দাম লিটার প্রতি ৬.৪৩ টাকা।

ডাইনোসরের কঙ্কাল

খুলি গুহার অরণ্যদেব মানে আমাদের কমিকস রাজ্যের অদ্ভুত রহস্যময় চরিত্র ফ্যান্টম। তার পোশাকী নাম ওয়াকার। আশ্চর্য সব জিনিস আছে তার সংগ্রহশালায়, যা আর পৃথিবীর কোথাও নেই। এমনি তার এক আশ্চর্য সংগ্রহ স্টেগি বা স্টেগোসোরাস। পৃথিবীর লুপ্ত ডাইনোসরের এক প্রতিনিধি।

অরণ্যদেবের নিজস্ব স্বর্গোদ্যানে বাস করে। তার ছবি দেখে আমরা খুশি হই। জীবন্ত তো কোনোদিনই কেউ দেখতে পাব না। যে সব ডাইনোসোরদের আমরা ছবি দেখি সেগুলিও কল্পনায় আঁকা। তাদের কিছু জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও পুরোপুরি কঙ্কাল পাওয়া গেছে খুব কম। সম্প্রতি একশ মিলিয়ন বছর আগের অতিকায় এক ডাইনোসর ইগুয়াডনের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যেটি অরণ্যদেবের স্টেগির চেয়ে আয়তনে হবে দশগুণ বেশি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেজুইক সংগ্রহশালায় জীবাশ্মটি কয়েকদিন পর থেকেই সবাই দেখতে পাবে।

বিষে বিষক্ষয়

কুকুর কামড়ালে হয় জলাতঙ্ক। রেবিজ ভাইরাস এই জলাতঙ্কের জন্য দায়ী। বসন্ত হয় আর এক ধরনের ভাইরাস থেকে। ডঃ জেনার প্রথম গো-বসন্তের ভাইরাস বা জীবাণু থেকে তৈরি করলেন বসন্তের প্রতিষেধক টীকা। একই পথে লুই পাস্তর তৈরি করলেন জলাতঙ্কের প্রতিষেধক। ভাইরাস শব্দের অর্থ বিষ। অর্থাৎ বিষে বিষক্ষয়।

মাকড়সা শিকার ধরে জীবন্ত খাদ্যকে জালে আবদ্ধ করে। তারপর সেই শিকারকে নিজ দেহ থেকে উৎপন্ন বিষ দিয়ে অসাড় করে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মানুষের এপিলেপ্সি বা প্যারালিসিস হলে বিভিন্ন স্নায়ু এবং পেশী অসাড় হয়ে যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মাকড়সার বিষ থেকে এপিলেপ্সি ও প্যারালিসিসের চিকিৎসার জন্য ওষুধ তৈরি করেছেন। ওষুধটির নাম গ্লুটামেট এন্‌টাগোনিসটস্‌। মাকড়সার বিষেই বস্তুটি থাকে। এই বস্তুটি মানুষের স্নায়ু ও পেশীর সাড় ফেরাতে পারে। অর্থাৎ এখানেও বিষে বিষক্ষয়। সমস্যা একটাই, মাকড়সার বিষে বস্তুটি থাকে খুব কম পরিমাণে। এখন চেষ্টা চলছে কম খরচে কৃত্রিম ভাবে বস্তুটি তৈরি করার।

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

দারুণ! দারুণ!
এই তো চাই!
মঁসিয়ে সার্জেন্ট.....
আমি জানি আপনার ওপরেই
আমি নির্ভর করতে পারি।
ম্যাম'জেল সার্জেন্ট বরখ্‌কে ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢুকতে বললো।
কফিনের মতো একটা অন্ধকার ক্যাবিনেটের মধ্যে থাকার মতো মনোবল খুব বেশি মানুষের থাকে না মঁসিয়ে।
কোনো চিন্তা নেই তোমার! ও সব ভয়-টয়ের বালাই আমার নেই!
উঃ, বিশ্বাসই হচ্ছে না! কতো সহজে ও লোকটাকে ওখানে ঢোকালো.....

মঁসিয়ে সার্জেন্ট! ভয় লাগছে না তো?
না, না..... কি যে বলো..... তোমার অনুষ্ঠান শুরু করো!
দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুতোর মিস্ত্রীকে দিয়ে বানানো ক্লোরোফর্মে ভেজা প্যাড সহ স্প্রিং-এর হাতটা ধাঁ করে এসে লাগলো সার্জেন্টের নাকে মুখে।
স্টেজের ওপর বিশেষভাবে তৈরি পাটাতনটা সরিয়ে ফেলতেই অজ্ঞান সার্জেন্টের দেহ নেমে এলো নিচে।
জার্মানরা খোঁজাখুঁজি শুরু করার আগেই একে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষুণি! কুইক.....
(চলবে)

ভবিষ্যতের ঠিকানা

অসিতকুমার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের চাকরি পাওয়া বেশ কষ্টকর। কিন্তু কোনো পেশাগত ট্রেনিং থাকলে চাকরি বা স্বনিযুক্তিতে প্রবেশ পেতে অসুবিধা নাও হতে পারে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা কোন পথে যাবে, তার একটা পথনির্দেশ এখানে দেওয়া গেল:

আই আই টি (বি টেক্ কোর্স)

ভারতের মোট পাঁচটি আই আই টিতে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানো হয়। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানো হয় শুধু বেনারস ও খড়্গপুর আই আই টিতে। পরীক্ষার ফর্ম কবে দেওয়া হবে তা জানান হয় নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্রে।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স

পশ্চিবমঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজি, মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়। মেরিট অনুযায়ী সিলেকশানের উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব্ এগজামিনেশান ফর অ্যাডমিশান টু ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিক্যাল এ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ডিগ্রি কলেজেস বি. ই. কলেজ ক্যাম্পাস্, হাওড়া-৩ এই পরীক্ষা গ্রহণ করে। জয়েন্ট পাশ করে নিম্নলিখিত কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়া যায়।

মেডিক্যাল—মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৭৩; আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৪; নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-১৪; ক্যালকাটা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-১৪; বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া-২; বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বর্ধমান-৪; নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, পোস্ট সুশ্রুতনগর-৭৩৪ ৪৩২; ডঃ আর. আমেদ ডেন্টাল কলেজ, কলকাতা-১৪।

ইঞ্জিনীয়ারিং—বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর (হাওড়া); রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর-৯; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২; জলপাইগুড়ি গভঃ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি-২।

টেকনোলজি—কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর (হুগলি); কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজি, কলকাতা-১০; কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, কলকাতা-১৫।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, যারা মেডিক্যাল/ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তি হতে চায়, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। আর যারা ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেকনোলজিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে চায় তাদের পরীক্ষা দিতে হবে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায়। প্রতি বছর এপ্রিল মাসের শেষে সাধারণত পরীক্ষা হয়।

প্যারামেডিক্যাল কোর্স

প্যারামেডিক্যাল কোর্সে পাশ করা যুবক-যুবতীর চাহিদা প্রচুর। উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হলে যে কোনো একটি কোর্স পড়তে পারো:

(১) লেবরেটারী টেকনোলজি।

(২) রেডিওগ্রাফি (এক্সরে)।

(৩) অফথ্যালমিক টেকনোলজি।

(৪) ই. সি. জি লেবরেটারী টেকনোলজি।

লেবরেটারী টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় পশ্চিমবঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক বছরের কোর্স। উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) নিয়ে উত্তীর্ণ ছাত্ররা এই ট্রেনিং নিতে পারে। হোস্টেল নাই।

কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডাল্ট কন্টিনিউইং এ্যাডুকেশন অ্যান্ড এক্সটেশন সেন্টার-এ রেডিওগ্রাফির ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। হোস্টেল নেই।

অফথ্যালমিক ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয় পশ্চিমবঙ্গের তিনটি মেডিক্যাল কলেজে—বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া; রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ অফথ্যালমলজি, মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৭৩; ডিপার্টমেন্ট অফ অফথ্যালমলজি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, সুশ্রুতনগর (শিলিগুড়ি)।

দু বছরের কোর্স। জীববিদ্যায় উচ্চমাধ্যমিকে শতকরা ৪০ নম্বর থাকলে এই কোর্স পড়া যেতে পারে। বয়স হতে হবে অন্ততঃ ১৫ বছর বা তার বেশি। আসন ৬০টি। মোট ৫০ নম্বরের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হবে। বিজ্ঞাপন বের হবার পর ফর্ম পাওয়া যাবে।

ই. সি. জি. লেবরেটারী টেকনোলজি কোর্স পড়ানো হয় ভেলোর খ্রীস্টান মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। সাধারণত মে মাসে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বিখ্যাত সংবাদপত্রে।

ডেয়ারিংয়ে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স

ডেয়ারি হাজবেন্ড্রির ডিপ্লোমা (আই. ডি. ডি) কোর্স পড়ানো হয় নিচের দুটি ইনস্টিটিউট-এ। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ্ অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রি এ্যান্ড ডেয়ারিং, হরিণঘাটা ফার্ম, পোঃ মোহনপুর (নদীয়া); এলাহাবাদ অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ-৭ (উঃ প্রদেশ)।

জীববিদ্যা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাশ ছাত্ররা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

অঙ্ক সহ উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাশ ছাত্ররা ভর্তি হতে পারে ডেয়ারী টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে (আই. ডি. ডি.)। পড়ানো

হয় এই ইনস্টিটিউট দুটিতে– ডেয়ারি সায়েন্স ইনস্টিটিউট, এরিয়া মিল্ক কলোনী, বোম্বে-৬৫; এলাহাবাদ অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ-২১১০০৭।

দু'বছরের এই কোর্সে প্রার্থী সিলেকশনের পরীক্ষা হয় নদীয়ার কল্যাণীতে।

বি. এস-সি (ডেয়ারী টেকনোলজী)

অঙ্কসহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্ররা কমপক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর পেলে বি এস-সি (ডেয়ারী টেকনোলজি) পড়তে পারে। প্রার্থী বাছাইয়ের পূর্ব ভারতের কেন্দ্র হচ্ছে কল্যাণী। আবেদন পত্র সংগ্রহ করার ঠিকানা– জয়েন ডিরেক্টর, ডেয়ারী সায়েন্স কলেজ, ন্যাশানাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কারনাল-১৩২০০১ (হরিয়ানা)।

লাইব্রেরী সায়েন্স সার্টিফিকেট কোর্স

এই কোর্স পড়ানো হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪ (এন্টালী পদ্মপুকুর)। উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই ট্রেনিং নিতে পারে। আসনসংখ্যা ৬০। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ইন্টারভিউ ডাকা হয়।

স্ট্যাটিস্টিকস-এ ডিগ্রী কোর্স

অঙ্ক ও ইংরাজি নিয়ে পড়া উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা তিন বছরের ব্যাচেলার অফ্ স্ট্যাটিস্টিকস (অনার্স) কোর্সে ভর্তি হতে পারে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা-৩৫ ঠিকানায়। বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে মে মাসে। বৃত্তি ১০০ টাকা প্রতি মাসে। দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা—ডিন অফ স্টাডিজ, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, ২০৩, বি টি রোড, (বরানগর) কলকাতা-৩৫।

এ ছাড়াও স্ট্যাটিস্টিক্যাল (অনার্স) ডিগ্রি পড়ানো হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এ. এম. ই (বিমান ইঞ্জিনীয়ার কোর্স)

এই কোর্স পড়ানো হয় এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভি. আই. পি রোড, কৈখালী, পোঃ আর-গোপালপুর ৭৪৩৫১৮ ঠিকানায়। তিন বছরের কোর্স। সেশন শুরু জুলাই ও ডিসেম্বরে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অঙ্ক নিয়ে সেকেন্ড ডিভিশন-এ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে আবেদন করা যাবে। আসনসংখ্যা ৪০।

পরীক্ষা হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে বা ছয় মাস অন্তর। ১ম ও ২য় সেমিস্টারে দশটি বিষয়, ৩য় সেমিস্টারে ছয়টি বিষয়, ৪র্থ ও ৫ম সেমিস্টারে পনেরোটি বিষয়। আড়াই বছর কোর্সের জন্য মোট খরচ হবে প্রায় ২,০০০ টাকা।

হোমিওপ্যাথি ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স

চার বছরের হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স পড়ে পাশ করলে হোমিওপ্যাথিক সরকারী হাসপাতালে ও অন্যান্য সংস্থায় চাকরি পাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নিজেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারো।

প্রার্থীর বয়স হবে ১৭ বছর বা তদূর্ধ্বে। বাংলা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হবার পর এই কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নামকরা দৈনিক পত্রিকায়। ভর্তির জন্য আবেদন পত্র পাঠাতে হবে—ডিরেক্টার অব হোমিওপ্যাথি ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডাস্ট্রি হাউস, ক্যামাক স্ট্রীট, কলকাতা। হোমিওপ্যাথির ডিগ্রি কোর্স (বি. এইচ. এম. এস.) পড়ানো হয় নিম্নলিখিত কলেজসমূহে— কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ২/২৬৬, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৯; ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-৪৬; খড়্গপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, মেদিনীপুর; পুরুলিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ পুরুলিয়া; মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, মেদিনীপুর।

জানো কী

- ☐ মহাকাশযান কসমস-৫ এর পাঁচশ কিলোমিটার দূরে উড়ে চলেছে কয়েকটা লাল চাকী। চোখে পড়তেই কনট্রোল রুমে বসে লাল বাতির সুইচটা টিপে ধরলেন ডঃ তালুকদার। আর তারপরই.....
- ☐ শুঁটকী মাছের চার ছিটিয়ে ভূত ধরতে বসলো ভূতো মিয়াঁ। ঠিক সেই সময়েই সেই আমবাগানে....কি হলো ?
- ☐ বাড়ি ঢুকতেই কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন পিসিমণি। পিত্তি জ্বলে গেলো তাঁর। তারপর ড্রইংরুমে ঢুকতেই.....
- ☐ ম্যাম'জেল ক্যাবিনেটের দরজা খুলে ফেললো। ভেতরে সার্জেন্ট নেই। দুর্দান্ত ম্যাজিক। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো জার্মান সৈন্যরা। কিন্তু....

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরো এমন অনেক কিছু যা দেখে আর পড়ে তোমরা চমকে উঠবেই।

রমেশচন্দ্র বসু স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

স্যার !

গার্গী বসু

অঙ্কের নতুন মাস্টারমশায় স্কুলে আসার পর থেকে সব ছাত্রদেরই খুব সুবিধা হলো, কারণ তিনি বেশ সহজ করে, সকলের বোধগম্য করে অঙ্ক কষাতে শুরু করলেন। যে কেউ যে কোনো প্রশ্ন করলে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহজ করে সব বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি একটা কারণে ছাত্রমহলে অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি কথায় কথায় সবাইকে উপদেশ দিতেন– 'শুধু পড়াশুনা করলে চলবে না, কায়িক পরিশ্রমও করতে হবে।' শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে উপদেশ শুনতে শুনতে সকলের কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। অথচ স্যারকে দেখে বোঝা যেত তিনি নিজে কোনো কায়িক পরিশ্রম করেন না। সবসময় ঝকঝকে ফিটফাট পোশাক পরে স্কুলে আসতেন। ক্লাশে পড়ানোর সময় সদাসতর্ক থাকতেন যাতে হাতে একটুও চকের গুঁড়ো না লাগে। শুধু ছাত্রদেরই নয় অন্যান্য স্যারদেরও তিনি কায়িক শ্রম সম্পর্কে নানান উপদেশ দিতেন, আর তাই নিয়ে সকলে আড়ালে হাসাহাসি করতেন। অবশ্য সামনে কিছু বলতেন না, কেননা তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। ছাত্ররাও পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য পেত বলে বিরক্ত হলেও তাঁকে কিছু বলত না।

সেই অঙ্কের স্যার একদিন নতুন বাড়ি করে স্কুলের কাছাকাছি চলে এলেন। সেন পাড়ার ওদিকে কোথায় যেন বাড়ি করেছেন। পল্টু, রমেন আর বিকাশ একদিন ঠিক করল স্যারের বাড়িটা চিনে আসবে। স্যারও বলেছেন বাড়ি গেলে অঙ্ক দেখিয়ে দেবেন।

এক্স-মাসের ছুটিতে এক বিকালে পল্টু, রমেন আর বিকাশ স্যারের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। পল্টু বলেছিল বইখাতা সঙ্গে নিতে। রমেন আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আগে বাড়িটা তো চিনে আসি।' একটা খালের ওপারে সেন পাড়া। খালের মুখটা নানান ঝোপঝাড়ে ভর্তি। ওরা খাল পেরিয়ে সেই সেন পাড়ার কাছে এল। কিছুদিন আগেও এ অঞ্চলটা ফাঁকা ছিল। একটা জলাভূমি ছিল এখানে। কচুরিপানার ফুলে ভরে থাকত নিচু মাঠটা। শীতকালে নানান পাখির আগমন ঘটত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গাটা ভরাট হয়ে অনেক নতুন বাড়িঘর উঠে গেছে। এসে গেছে বিজলী বাতি।

শীতের বিকেল। সূর্য ডুবে আকাশ রঙে রঙে ছেয়ে গেছে। কয়লার উনুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। স্যারের নির্দেশিত গলিটার মুখে এসে তিন বন্ধু দেখতে পেল আধো অন্ধকারে গেঞ্জি পরা কুলি গোছের একটা লোক কোদালে করে ঝুড়িতে মাটি ভরছে। এ অঞ্চলের জমি নিচু বলে ট্রাকে করে মাটি এনে জমি উঁচু করা হয়। ট্রাক সরু রাস্তার মোড়ে মাটি ফেলে যায়। তারপর কুলি মজুর দিয়ে সেই মাটি তুলে নিয়ে বাড়িতে ফেলা হয়। এই অঞ্চলের মজুররা এখন নতুন বাড়িতে মাটি, বালি আর নির্মাণের নানান সাজসরঞ্জাম বহনের জন্য বেশ কাজ পায়। প্রত্যেক বাড়ির মালিককেও তারা চেনে। বিশেষ করে মাস্টারমশায় বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। ওরা অঙ্কের স্যারের বাড়ির হদিস জানতে লোকটির সামনে এগিয়ে গেল।

পল্টু বলল, 'ভাই, এখানে মাস্টারমশায়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?'

ওদের প্রশ্ন শুনে লোকটা কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল আর তখনি তিন বন্ধুর মনে হলো— হে ধরণী দ্বিধা হও! লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং অঙ্কের স্যার। ওরা যে কি বলে ক্ষমা চাইবে তা ঠিক করে উঠতে পারলো না।

তাঁকে এ অবস্থায় ছাত্ররা আবিষ্কার করে ফেলায় অঙ্কের স্যার হেসে বললেন— 'কি করব বলো, নিজের কাজ তোমাদের নিজে করতে বলি। আর আমি তা না করলে চলবে কেন! তাছাড়া ফুলগাছের গোড়ায় সাবধানে মাটি না ফেললে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

এবার পল্টু একটু সাহস করে বলল– 'স্যার, আপনি বেশ ঘেমে গেছেন। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমরা বাকি মাটিটা তুলে দিচ্ছি। একটা গাছও আমরা নষ্ট করব না।'

ছবি : সৃফি

রমেশচন্দ্র বসু স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

শিক্ষা

শংকর চক্রবর্তী

সকালবেলাই কিছু লোক এসে অভিষেকদের বাড়ির কাছে দাঁড়াল। সে দেখলো লোকগুলির কাছে করাত, কুঠার, দড়ি ও আরও কি সব রয়েছে যার নাম অভিষেক জানে না। ব্যাপারটা ঠিক ও বুঝতে পারল না। অভিষেকের আজ স্কুল ছুটি তাই বালতিতে করে জল নিয়ে ফুলগাছে দিচ্ছিল। বাইরে থেকে আসা লোকগুলির ভিতর থেকে একজন বলল, 'খোকা, বিশ্বনাথবাবু বাড়ি আছেন?' অভিষেক বলে, 'আছেন, একটু দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেলো অভিষেক ও তার বাবাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। লোকগুলি বিশ্বনাথবাবুকে হাত তুলে নমস্কার করল। বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'আরে আজই তোমরা এসে গেছো! আজকে তো হবে না, এখন আমি অফিস বেরবো।' অভিষেক বুঝতে পারল না, ব্যাপারটা কি! সে বাবাকে জিজ্ঞাসা কলল, 'বাবা এরা কেন এসেছে?' বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'এই নিম গাছটা কাটার জন্য। গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। এর জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কেটে ফেললে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' বিশ্বনাথবাবু লোকগুলিকে রবিবার আসতে বলে ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

পরীক্ষা কাছেই, অভিষেক পড়ায় ব্যস্ত। রাত যখন সাতটা, বিশ্বনাথবাবু অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন। জামা কাপড় পালটে অভিষেকের পড়ার ঘরে ঢুকে বললেন, 'লেখাপড়া ঠিক করছ তো অভিষেক? পরীক্ষার কিন্তু আর বেশি দেরি নেই।' কথা কটি বলে তিনি সোফায় বসলেন। অভিষেক বলল, 'বাপী পরিবেশ দূষণ ও মানবজীবনে গাছের অবদান' রচনাটি নিয়ে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। আমি নিজে অবশ্য লিখেছি। তুমি যদি একটু দেখে দাও তা হলে ভাল হয়।'

বিশ্বনাথবাবু রচনার খাতাটি অভিষেকের কাছ থেকে নিয়ে দেখতে লাগলেন। এক সময় বললেন, 'অভি, সবই ঠিক আছে তবে পরিবেশ দূষণ রোধে গাছের একটি বিরাট অবদান আছে যা তুমি বাদ দিয়ে গেছো।' অভিষেক বিশ্বনাথবাবুকে বলল, 'তুমি একটু বল না বাপী, আমি লিখে নিচ্ছি।'

বিশ্বনাথবাবু বলতে শুরু করলেন, 'মানবজীবনে গাছের অবদান অপরিসীম। গাছ আমাদের ফুল দেয়, ফল দেয়। গাছের এই ফল নানা খনিজ লবণে ভরপুর। ফল খেলে আমাদের শরীরে পুষ্টি হয়। কত রোগের ওষুধ এই গাছ থেকেই তৈরি হয়। হোমিওপ্যাথির জনক হ্যানিমান তাইতো বলেছিলেন, "আমি যদি একটা গাছ বাঁচাতে পারি তা হলে লক্ষ লোকের জীবন বাঁচাতে

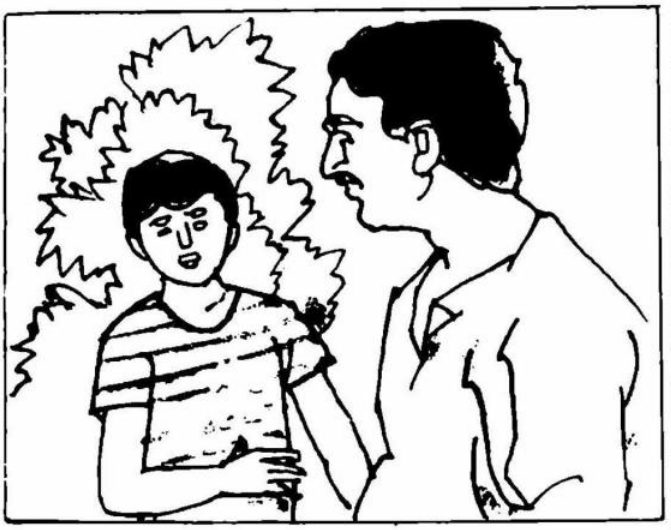

পারবো।" এছাড়া গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে, বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে নিজে গ্রহণ করে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অক্সিজেন না থাকলে জীবের অস্তিত্বই থাকবে না। কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া প্রতিনিয়তই বায়ু দূষিত করছে, আর এই দূষণকে একমাত্র গাছই রোধ করতে পারে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতির হাত থেকে গাছই পরিবেশকে ঠিক রাখতে পারে। আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরি করতে গাছ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। মরুভূমিকে সুজলা সুফলা করতে আজ তাই গাছ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং পরিবেশকে যদি দূষণমুক্ত রাখতে হয়, যদি মানবজীবনকে টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে গাছকে ধ্বংস না করে এর বৃদ্ধিই হবে আমাদের একমাত্র কাম্য।' তিনি অভিষেককে বললেন, 'এই বার তুমি যা লিখেছো তার সঙ্গে এটি যোগ করে দাও।'

অভিষেক বলল, 'বাপী গাছের যে এত গুণ তা তো আমি জানতাম না। তবে একটি জিনিস আমার খুব অবাক লাগছে। গাছ আমাদের এত উপকার করছে তুমি বললে, আবার তুমিই তাকে কেটে ফেলার জন্য লোক লাগাচ্ছো! তাহলে কি বুঝব মানুষ কথায় যা বলে কাজের বেলায় তা মেনে চলে না?'

বিশ্বনাথবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ঠিক বলেছো। নিম গাছটা কাটা হবে না।'

ছবি : সৃফি

এঁদের লেখাও ভালো :

সুস্মিতা বল, দুর্গাপুর- শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডুপুকুর, বর্ধমান।। বিশ্বনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।। তিমিরবরণ চঁদ, গুসকরা, বর্ধমান।। পার্থপ্রতিম লোধ, ফুলছড়ি, ত্রিপুরা।। বিশু মিত্র, কলকাতা-৫৯।। বিপ্লব পাল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।। বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস, দুর্গাপুর-

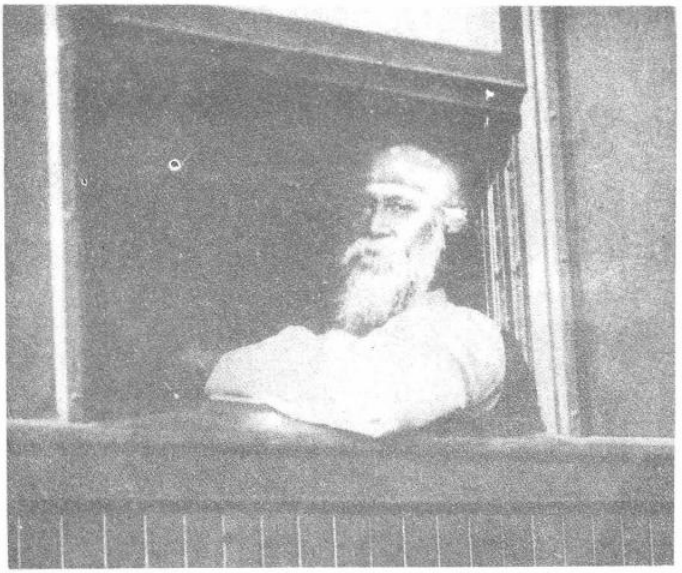

সেলুনের জানালার ধারে বসে কবি আসছেন কলকাতায়

চিরন্তনী

তপন দাম

কবিগুরু নিজেই যেন তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলির ভূমিকা লিখেছিলেন এই কটি ছত্রে।

১৯৪১-এর ২৫ জুলাই সাধের শান্তিনিকেতন ছেড়ে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। ভোর থেকেই সেদিন উত্তরায়ণের আঙিনায় সমবেত হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ইত্যাদি সমস্ত আশ্রমিক এবং কবির অনুগত অন্তরঙ্গরা। গুরুদেবকে যেতে দিতে চাইছিল না তাঁদের মন। তবু আশায় বুক বেঁধে তাঁরা বিদায় জানালেন

এই সেই সেলুন—যার নাম চিরন্তনী

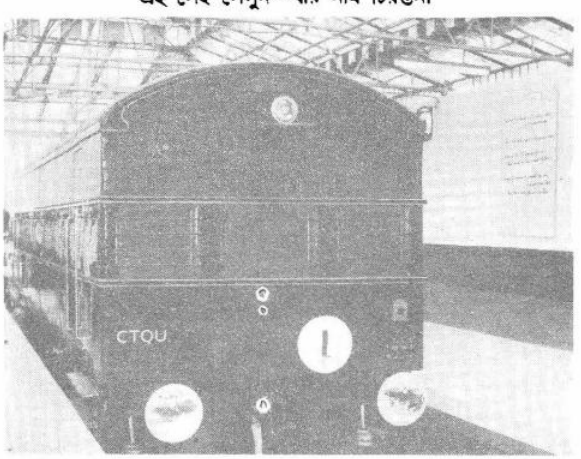

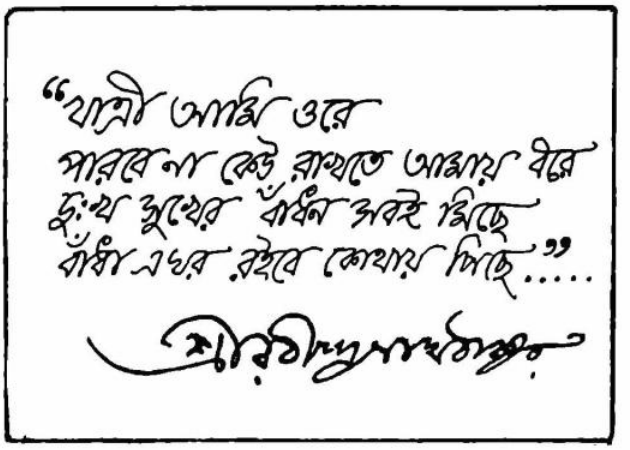

গানের সুরে—

আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন
তার আকাশভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে
মোরা বারে বারে দেখি তারে
নিত্যই নূতন....

ওদিকে বোলপুর স্টেশনে ট্রেন অপেক্ষা করছিল কবিকে নিয়ে যাবার জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট

চিরন্তনীর মধ্যে

নিবারণচন্দ্র ঘোষ নিজের সেলুনটি এনেছিলেন যাতে অসুস্থ কবির রেলযাত্রায় কোনো অসুবিধা না হয়। এই সেলুন শুধুমাত্র অফিসের কাজেই ব্যবহার করার কথা। কবির জন্য নিয়ম ভেঙেছিলেন নিবারণবাবু। প্রশস্ত জানালার ধারে বসে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কবিও বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য ভুলতে পেরেছিলেন রোগযন্ত্রণার কথা। অজয় নদীর সেতু পার হওয়ার সময় রানী মহলানবিশ সেদিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি যে চির পথিক। তাঁর মন, তাঁর কল্পনা যে দেশ দেশান্তরে ছুটে বেড়িয়েছে চিরদিন। এমন কি পথের দু পাশেই যে তিনি দেখেছেন তাঁর দেবতার আবাস—

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

শান্তিনিকেতন থেকে ঐ যাত্রাটিই কিন্তু কবির শেষ যাত্রা। এর তেরোদিন পর ২২শে শ্রাবণ (৭ অগাস্ট, ১৯৪১) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অস্তমিত হলেন কবিসূর্য। গুরুদেবকে ফিরে পাবার আশা পূর্ণ হলো না শান্তিনিকেতনবাসীর।

কবিকে পার্থিবভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও তাঁর পবিত্র স্মৃতিসহ ঐ সেলুনটি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বর্তমান পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কবিগুরুর ১২৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে। সেই থেকেই তাঁরা সেলুনটির ব্যবহার বন্ধ করে দেন এবং রবীন্দ্র-স্মৃতি নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতদিন সেলুনটি থাকতো লিলুয়া ওয়ার্কশপে। আগে এটি ব্যবহৃত হতো অফিসের কাজে।

এ বছর ২৫শে বৈশাখের ঠিক দুদিন আগে এই সুন্দর সবুজ রঙের সেলুনটিকে একটি বিশেষ ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বোলপুর স্টেশনে। সেলুনে রয়েছে কবির ব্যবহার করা খাট ও চেয়ার। সেলুনটি সাজানো হয়েছে তাঁর কিছু ফটোগ্রাফ ও তাঁর আঁকা ছবি দিয়ে। জন্মোৎসবের দিন সকালে ঐ সেলুন মিউজিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে। এই উপলক্ষে সুন্দর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিলেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বোলপুর স্টেশনে গেলে তোমরাও দেখতে পাবে কবির স্মৃতিপূত এই সেলুনটিকে, যার নাম চিরন্তনী।

বোলপুর স্টেশনে চিরন্তনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, কে. সি. লেঙ্কা, সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যরা।

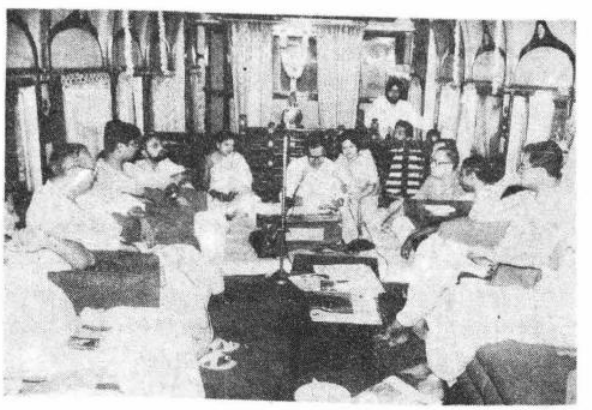

চিরন্তনীর উদ্বোধন উপলক্ষে ট্রেনে বিশেষ বিচিত্রানুষ্ঠান

ছবিঃ পূর্ব রেলের সৌজন্যে

নিবেদন

শুকতারার শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এখন থেকে লেখা পাঠাবার এবং চিঠি লেখার সময় তাঁরা যেন বিভাগ ও পত্রিকার নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করেন। যেমন দাদুমণির চিঠি/তোমাদের জিজ্ঞাসা/মজার পাতা/তোমাদের পাতা অথবা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা, c/o সম্পাদক, শুকতারা, ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা–৯।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোচিন

মহীশূর থেকে স্বামীজী কোচিন যাবেন শুনে মহারাজ কোচিনের দেওয়ান শ্রীযুক্ত শঙ্করিয়ার নামে একটি পত্র লিখে দেন। গরুর গাড়ি চড়ে ত্রিচুরে এসে পথের পাশে দাঁড়ানো এক পথিককে স্বামীজী জিজ্ঞেস করেন, কোথায় গেলে তিনি একটু স্নান করতে পারবেন। পথিক শ্রীযুক্ত ডি. এ. সুব্রহ্মণ্য আয়ার স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে স্নান-থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। গলায় কফ জমেছে দেখে ওষুধের ব্যবস্থাও করলেন।

ত্রিচুরে কয়েকদিন থেকে স্বামীজী কোডাণ্ডানাল্লুরের বিখ্যাত কালীমন্দির দেখতে গেলেন। স্বামীজী মন্দিরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় সেখানকার পুরোহিতরা তাঁকে আটকে দিল। স্বামীজীও নির্বিকারভাবে সামনের বটগাছের তলায় তিন-চারদিন বসে রইলেন। রোজই দু-জন রাজকুমার স্বামীজীর কাছে এসে সংস্কৃতে আলাপ করত। স্বামীজী তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। পরে রাজবাড়ির মেয়েরাও এসে সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করল। মেয়েদের মধ্যেও এমন সংস্কৃত চর্চা দেখে স্বামীজী অবাক হয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর চিকাগোর বিজয় সংবাদ স্বামীজীর ছবি সমেত খবরের কাগজে ছাপা হলে রাজবাড়ির লোকেরাও তা দেখে। তারা চিনতে পারে যে ইনিই হচ্ছেন সেই বটতলার সাধু।

ত্রিবাঙ্কুর

কোচিন ছেড়ে স্বামীজী ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছলেন। ওই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশেরই মতো—নদী-নালা, শ্যামল শস্যভরা মাঠ, নারকেল গাছের সারি। ত্রিবান্দ্রমে স্বামীজী অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের বাড়িতে অতিথি হন। অধ্যাপক ছিলেন রাজবাড়ির গৃহশিক্ষক। সেই সূত্রে রাজ্যের যত জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক—সকলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হলো। সবাই তাঁর উদার ও গভীর মতের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলে স্বামীজী তা এড়িয়ে গেলেন। এতে সবাই বিস্মিত হলো এই কথা ভেবে যে এমন ব্যক্তিকে মহীশূরের মহারাজ কি করে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি করে পাঠাতে চান!

প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যাপারে স্বামীজী তাঁদের জানিয়েছিলেন পরমেশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় স্বামীজীকে তাঁর মুখপাত্র করবেন তবে

তাই হবে। পরমেশ্বর তখন তাঁকে তেমন উপযুক্ত শক্তিও দেবেন।

বাড়িতে জ্ঞানী-গুণী সমাবেশের ফলে এক গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির শিশুরা তাদের প্রাপ্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতো না। স্বামীজী কয়েকটি তামিল শব্দ শিখে নিয়েছিলেন। বাড়ির পাচকের সঙ্গে সে ভাষায় কথা বলে শিশুদের মধ্যে হাসির বন্যা বইয়ে দিতেন। সেইসব আনন্দের স্মৃতি বাড়ির লোকজন অনেকদিন মনে রেখেছিলেন। স্বামীজী চলে গেলে তাঁদের মনে হলো বাড়িটা যেন অন্ধকারে ডুবে গেছে।

কন্যাকুমারী-মাতা

এবার স্বামীজী কন্যাকুমারী-মাতা দর্শনে হাজির হলেন কেপ কমোরিনে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে, ১৮৯২ সালে। তিনি এলেন মাকে দর্শন করতে। কন্যাকুমারীর মন্দির ভারতের শেষ প্রান্তে। তার তিন দিকেই উত্তাল সমুদ্র—পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারতমহাসাগর। মন্দিরে মা-কুমারী শিবের চিন্তায় বিভোর। মূর্তিটির এমন বৈশিষ্ট্য যে তাকালেই হৃদয়ে ভক্তিভাবের সৃষ্টি হয়। স্বামীজী বালকের মতো মায়ের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রাণ ভরে মাকে পূজা আর স্তব-স্তুতি করে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রের তীরে। দূরে প্রায় দু'ফারলং তফাতে জলের মধ্যে দেখলেন বিরাট এক শিলাখণ্ড। জলে হাঙর ঘুরছে, মাঝিরা নৌকা এনে শিলাখণ্ডে পৌঁছে দিতে চাইল। কিন্তু পারানি হিসাবে তারা চায় এক আনা পয়সা। কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী তা পাবেন কোথা থেকে? অথচ ঐ পাথরের উপর বসে ধ্যান করতে মন চাইছে। ভেবে-চিন্তে জলে ঝাঁপ দিলেন স্বামীজী। সাঁতার কেটে ওখানে যাবেন। তাই দেখে মাঝিরা মজা করার জন্য চিৎকার করে বলল, সাধুজী ওখানে খাবেন কী? স্বামীজী সাঁতার কাটতে কাটতে উত্তর দিলেন, কিছু খাওয়াতে চাও তো দুধ আর ডাব দিয়ে এসো।

শিলাখণ্ডের উপর বসে স্বামীজী মা-কন্যাকুমারীর জ্যোতির্ময় মূর্তির ধ্যান করছেন। ধীরে ধীরে দেশমাতৃকা ভারতমাতার মূর্তিও তাঁর মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কখন রাত পেরিয়ে সূর্যোদয় হলো সে হুঁশই তাঁর নেই। কেউ বলে স্বামীজী নাকি শিলাখণ্ডের ওপর তিন দিন তিন রাত্রি ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁর কথামতো দুধ-ডাব পৌঁছে দিয়ে আসত।

স্বামীজীর মনপ্রাণ জুড়ে তখন শুধুই ভারতমাতার চিন্তা। এই ভারতমাতার কোলেই যুগে যুগে নানা ধর্ম জন্ম নিয়েছে। কিন্তু কালে সেই সনাতন ধর্মের আচরণের মধ্যে এসেছে বিকৃতি। মা হারিয়েছেন তাঁর পূর্ব গৌরব। স্বামীজী ধ্যানের মধ্যে খুঁজছেন মাকে তাঁর হারানো গৌরব ফিরিয়ে দেবার উপায়। ধ্যানের পর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে ভারতকে তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে দিতে হলে চাই সর্বজাতির উন্নতি আর দারিদ্র্যমোচন। ধর্ম ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বসাধারণের মধ্যে। এজন্য চাই ত্যাগ ও সেবা।

রামনাদ

ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী এবার পদব্রজে দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে রামনাদ যাত্রা করলেন। সেখানে রামনাদের রাজা শ্রীভাস্কর সেতুপতির অতিথি হলেন। সেতুপতি স্বামীজীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামীজী এ পর্যন্ত যত রাজার সঙ্গে মিশেছেন

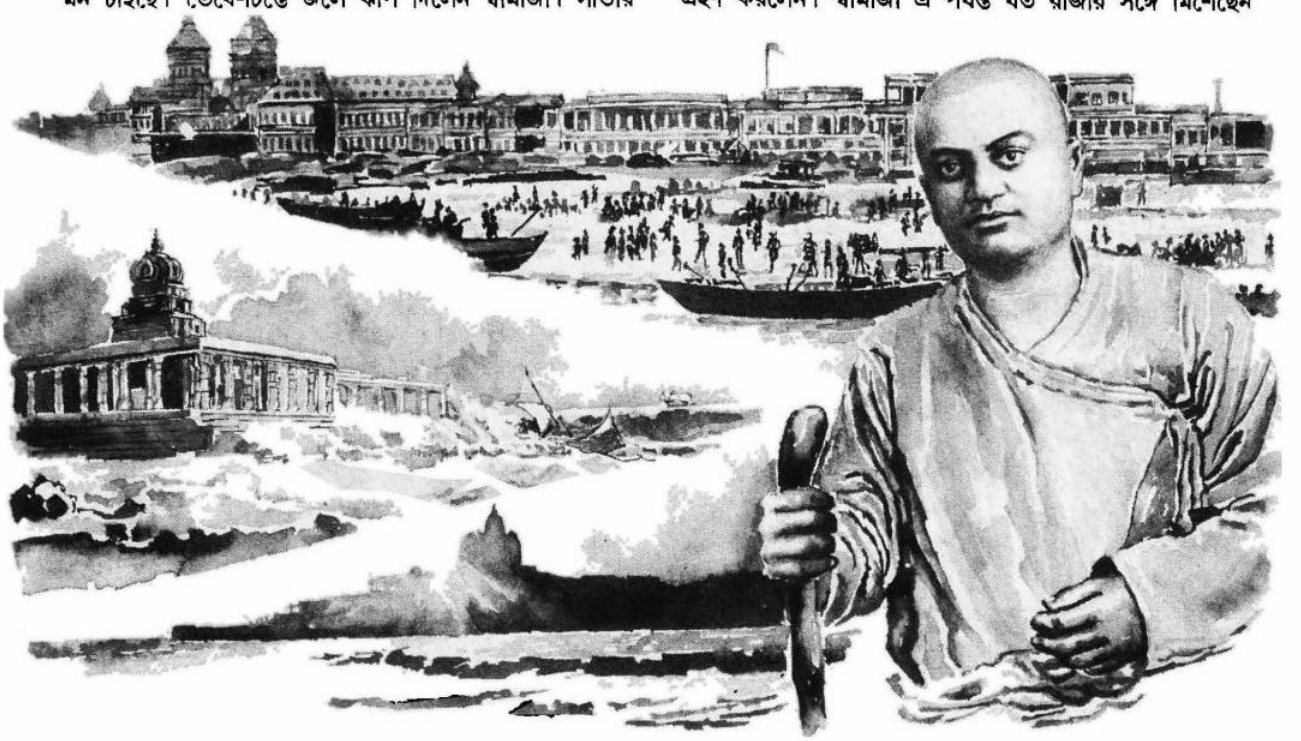

তাঁদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সবচেয়ে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধার্মিক। স্বামীজীর সব কথা শুনে সেতুপতি তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু স্বামীজী তখন রামেশ্বর দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

রামেশ্বর

রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতের বারাণসী। রামেশ্বর মন্দিরের সবটাই বিশাল। এর প্রবেশদ্বার একশ'ফুট উঁচু। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় করে এখানে শিবপূজা করেছিলেন। শিবদর্শন ও পূজা করা স্বামীজীর অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এবার তা পূর্ণ হলো।

এবার মাদ্রাজের দিকে

শুভ নববর্ষ, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজীর বয়স ত্রিশ পূর্ণ হয়ে একত্রিশে পড়ল। এই বছরটি স্বামীজীর জীবনে বড় গুরুত্বপূর্ণ।

কেউ কেউ বলেন স্বামীজী রামনাদের উত্তরের পথ ধরে পায়ে হেঁটে বিখ্যাত তীর্থস্থান মাদুরায় ঘুরে বেড়ান। তারপর পণ্ডিচেরী যান। তখন পণ্ডিচেরীতে ফরাসীরা রাজত্ব করত। এখানে শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়ে যায়। ভট্টাচার্যমশাই কোনো কাজে সেখানে এসেছিলেন। তিনি স্বামীজীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখলেন। পণ্ডিচেরীর উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দুদের স্বামীজী সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, এমন দিন আসছে যখন শূদ্রেরা জাগবে আর নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবি করবে। তাই সময় থাকতে তাদের শিক্ষা দিয়ে, সম্মান দিয়ে, তাদের মধ্যে বেদান্ত ধর্মের সর্বজনসাধ্য তত্ত্বগুলি প্রচার করে নিজেদের বেঁচে থাকার রাস্তা করে নিতে হবে। নইলে নিজেদেরই শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে হবে।

মাদ্রাজ

এদিকে মন্মথবাবু মাদ্রাজে তাঁর এক বন্ধুকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেন যে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে মাদ্রাজে ফিরছেন। স্বামীজী মাদ্রাজে পৌঁছে দেখলেন, শহরের উচ্চশিক্ষিত বারো-চোদ্দ জন যুবক তাঁকে নিতে এসেছেন। পরে তাঁরা স্বামীজীর শিষ্য হয়ে যান। এ ছাড়া প্রথম দিন থেকেই অনেকে রোজ ভট্টাচার্যমশাই-এর বাড়িতে আসতেন স্বামীজীকে দর্শন করতে। স্বামীজীও যেন এই সময় মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো জ্বলে উঠেছিলেন তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। এই শিব-রশ্মি আর লুকানো যাচ্ছে না। ইতিহাস বলে, মাদ্রাজেই স্বামীজী জনসমক্ষে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন দৈবনির্দেশে। মাদ্রাজের ভক্তরাই স্বামীজীর চিকাগো যাবার বন্দোবস্ত পাকা করেন। স্বামীজীর মধ্যে গুরুশক্তি এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

স্বামীজীর গুরুভাবের প্রকাশভঙ্গিমা কেমন তা বোঝাতে তাঁর ছেলেবেলার একটা ঘটনা বলতে হয়। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত খুব বড় উকিল। আয় অনেক, ব্যয় তার চেয়ে বেশি। নিজের ঘোড়ার গাড়িতে কাছারীতে যাওয়া-আসা করেন। বিদ্যাচর্চা আর অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন খুব। এমন কি নিজে হাতে ভাল রান্নাও করতেন শখ করে। এত উদার হৃদয় ছিল যে জেনেশুনে অলস-অকর্মণ্য-চোর-বদমাশদেরও খেতে দিতেন। একদিন ছেলেকে কোলে বসিয়ে বাবা-মা বাইরে চলেছেন। কৌতুক করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরে বিলে, বড় হয়ে তুই কি হবি?

বিলে তো প্রায় সময়ই ঘোড়াশালায় কোচোয়ানের সঙ্গে গল্প করে। সে দেখে মানুষটি কেমন বিজ্ঞের মতো কথা বলে। চাবুক নিয়ে সারা শহর দাপিয়ে বেড়ায়, দুরন্ত ঘোড়া দুটোকে ধমকে বশে রেখে পছন্দমত রাস্তায় টেনে নিয়ে চলে মস্তবড় গাড়িটাকে। তাই বাবার প্রশ্নে বিলে চটপট উত্তর দিল, কোচোয়ান হবে। ঘোড়াকে চাবকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে গাড়ি।

এক পণ্ডিত তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করেন, সময়ের অভাবে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ বা সন্ধ্যাবন্দনাদি না করলেই বা ক্ষতি কি? অমনি রেগে উঠে স্বামীজী বলেন, 'সেইসব বিরাট পুরুষ, সেইসব প্রাচীন ঋষি—যাঁরা এত বড় ছিলেন যে তাঁরা পায়ে মাটি না মাড়িয়ে দেশ-বিদেশ ডিঙিয়ে যেতেন বললেই চলে, যাঁদের কথা মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করতে গেলে আপনার মতো লোক নিজেকে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না—তাঁদের পর্যন্ত সময় ছিল মশায়, আর আপনার নেই?'

ঐরকম আর এক অধিবেশনে, 'ব্রহ্মেরও সাক্ষাৎকার সম্ভব', স্বামীজীর এ কথা একজন পণ্ডিত হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন দৃপ্তকণ্ঠে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি সে অজানাকে জেনেছি।'

সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র নামে এক নাস্তিক স্বামীজীর কাছে আসেন। মুদালিয়র ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বামীজীর চিন্তাধারায় তিনি এতই প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে এর পর আজীবন স্বামীজীর একান্ত সেবক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আদর করে স্বামীজী কিভি বলে ডাকতেন। ইনিই স্বামীজীর ইচ্ছায় মাদ্রাজে প্রথম 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেমন কলকাতায় স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বাংলা পত্রিকা 'উদ্বোধন' প্রকাশ করেন।

এখন থেকে স্বামীজী খোলাখুলি বলতে শুরু করলেন যে তিনি সনাতন ধর্ম প্রচার করতে পাশ্চাত্যে যেতে চান। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে গুণগ্রাহীরা সবাই একমত। এমন এক ব্যক্তিত্বকে সনাতন ধর্মের ধারক-বাহক হওয়ার স্বীকৃতি দিতে সবাই প্রস্তুত। যেখানে যেখানে তিনি গেছেন, প্রতিটি জায়গার প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে যাচাই করে নিয়েছেন। তিনি যে নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাঞ্চন শিবস্বরূপ তাতে আর দ্বিমত নেই। তাই জনসাধারণের মধ্যে থেকে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে এসে প্রায় পাঁচশ টাকা চাঁদা তুলে স্বামীজীর সামনে রাখল। হায় ছেলেমানুষের বুদ্ধি! এই সামান্য টাকা দিয়ে বিদেশ যাত্রা হয় নাকি! স্বামীজী ঐ টাকা আবার গরীবদের বিলিয়ে দিতে বললেন। শিষ্যরা তো অবাক, আরো টাকা না হয় যোগাড়ের চেষ্টা করা যাবে, কিন্তু সঞ্চিত টাকা বিলিয়ে দিলে অত টাকা জমবে কবে! তবু দিতেই হলো, গুরুর আদেশ। স্বামীজীও স্বস্তি পেলেন।

[চলবে]

ছবি : বিজন কর্মকার

শ্রীলঙ্কায় লড়তে হবে

শা. প্রি. ব

এই মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছে। আজহারউদ্দিনের দল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট ও তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে। আজহারউদ্দিনের পর শচীন তেণ্ডুলকার যে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সে বিষয়ে এখন আর কারো সন্দেহ নেই। শচীনই শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে যাচ্ছেন। তবে ভারতীয় দলে এবারও জায়গা হয়নি সঞ্জয় মঞ্জরেকারের। সঞ্জয় দক্ষ ব্যাটসম্যান। কিন্তু এখন দলে এতো ভালো খেলোয়াড়ের ভিড় যে একবার বাদ পড়লে সেই হারানো জায়গা ফিরে পাওয়া খুবই মুশকিল। তাই রবি শাস্ত্রীও আর হয়তো কোনোদিনই ভারতীয় দলে ফিরে আসতে পারবেন না। সে যাই হোক শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছেন আজহারউদ্দিন (অধিনায়ক), শচীন তেণ্ডুলকার (সহ-অধিনায়ক), নবজ্যোৎ সিধু, মনোজ প্রভাকর, বিনোদ কাম্বলি, কপিলদেব, শ্রীনাথ, অনিল কুম্বলে, বেঙ্কটপতি রাজু, বিজয় যাদব, রাজেশ চৌহান, সলিল আঙ্কোলা, প্রভীন আমরে, কিরণ মোরে, ডব্লিউ ভি রামন ও অজয় শর্মা।

শ্রীলঙ্কা রীতিমতো শক্তিশালী দল। ইংলন্ড আর জিম্বাবুয়ের খেলোয়াড়দের কুম্বলে, রাজু আর চৌহান মাথা তুলতে দেননি বলে শ্রীলঙ্কায় গিয়েও যে তাঁরা দাপট দেখাবেন এ কথা মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে। শ্রীলঙ্কায় বেশি দরকার মিডিয়াম পেস বোলারদের। শ্রীনাথ মনে হয় ভালো খেলবেন। কপিলকে তো খেলতেই হবে। কপিলের সংগ্রহে এখন ৪২০টি উইকেট। আর ১২টি উইকেট পেলেই তিনি ডিঙিয়ে যাবেন স্যার রিচার্ড

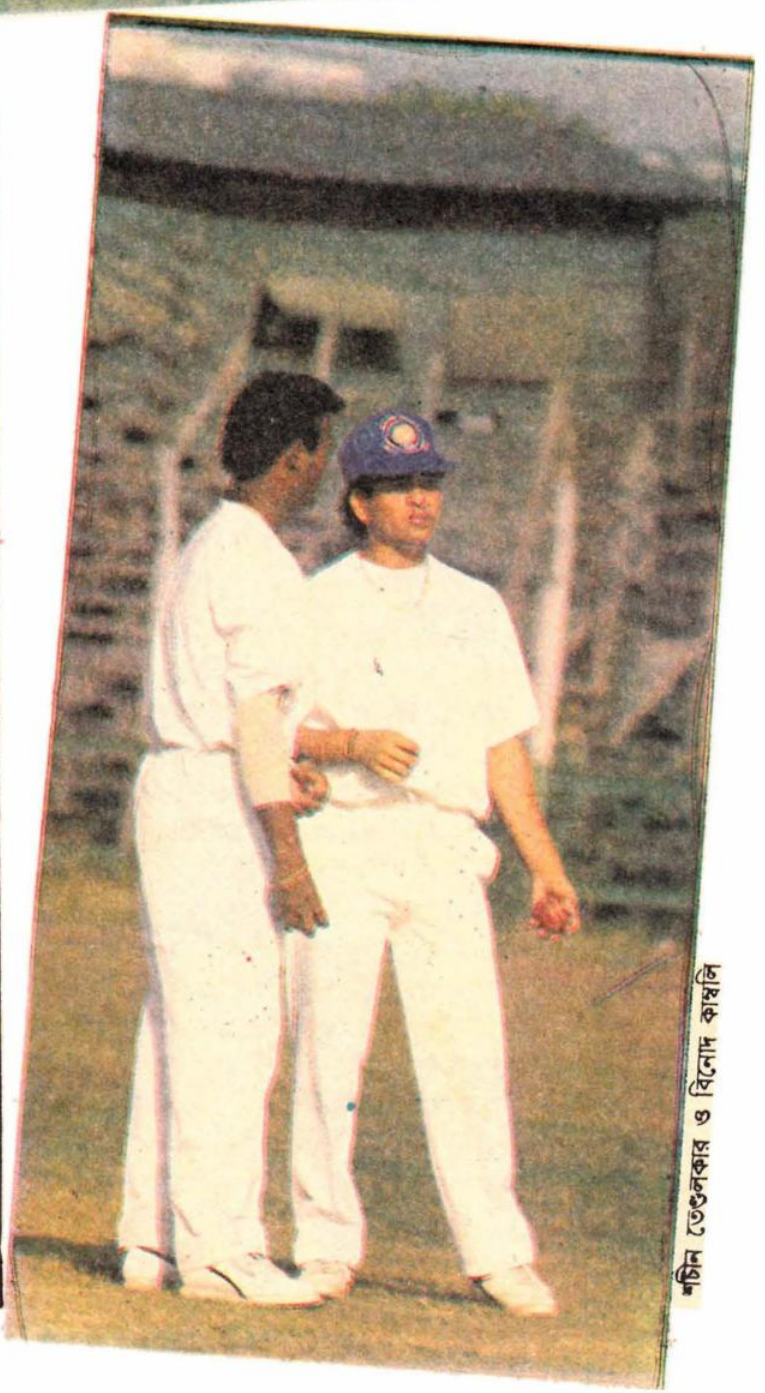

শচীন তেণ্ডুলকার ও বিনোদ কাম্বলি

হ্যাডলিকে। তিনটি টেস্টে ১২টি উইকেট পাওয়া হয়তো তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তার জন্যে আজহারউদ্দিনের সহযোগিতা দরকার। কপিলকে দিয়ে অনেক বেশি বল করাতে হবে। আজহার কি তা করাবেন? তবে কপিল যে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। শ্রীনাথ ও কপিল ছাড়া মনোজ প্রভাকর তৃতীয় মিডিয়াম পেস বোলারের দায়িত্ব নেবেন। আর দরকার পড়লে দলে আসবেন সলিল আঙ্কোলা।

একদিনের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা কিন্তু রীতিমতো সাড়া-জাগানো দল। ইংলন্ডকে তো কি টেস্ট, কি একদিনের ক্রিকেট—কোনোটাতেই মাথা তুলতে দেয়নি। তা গ্রাহাম গুচের দলটা যে নেহাতই বাজে তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের কাছে গো-হারা হেরে গুচ আর কিথ ফ্লেচার বলেছিলেন, আমাদের দেশের মাঠে গেলে ভারতের এই দলকেই আমরা হেলায় হারাবো। ভারত যায়নি কিন্তু ইংলন্ডে খেলতে গেছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যালান বর্ডারের দলের বিরুদ্ধেও ইংলন্ডের আজ একই হাল। আসলে ইয়ান বথাম আর ডেভিড গাওয়ারকে বাদ দেবার জন্যেই ইংলন্ড দলের ঐ শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ওঁরা দুজন দলটিকে রীতিমতো শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। তাই ফাইনালেও উঠেছিলো ইংলন্ড। ফাইনালে তাঁদের হার মানতে হয়েছিলো ইমরানের পাকিস্তানের কাছে। ইয়ান বথাম বলেছেন, এই মরশুমের শেষে তিনি অবসর নেবেন। অবসর নেবার আগে তাঁর ইচ্ছে শেষবারের মতো জাতীয় দলে খেলা। কিন্তু টেড

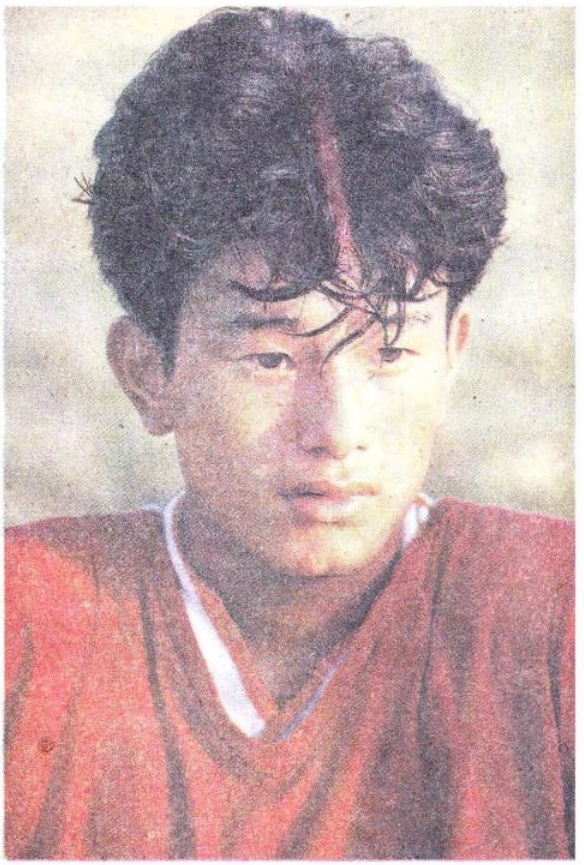

বাইচুং ভুটিয়া

ডেক্সটাররা ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আর ডেভিড গাওয়ার টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান করার ইচ্ছেয় দলে ফিরতে চান।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিচ্ছেন পেশেক। পাশে অরুণ ঘোষ।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে তুষার, ফিরোজ, কার্লটন ও পাপ্পা।

তাঁর ফর্মও যথেষ্ট ভালো। শুধু গুচের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলে তিনি বাদ। এই সব নিয়ে ইংলন্ডে খুব হৈচৈ হচ্ছে। আমাদের দেশেও হলে ভালো হতো। সঞ্জয় মঞ্জরেকার আর সুব্রত ব্যানার্জিকে দলে নেওয়ার দরকার। অজয় শর্মা আর সলিল আঙ্কোলার জায়গায় তো নেওয়া যেতো। সঞ্জয় কার বিষনজরে পড়েছেন জানি না তবে সুব্রতকে যে আজহারউদ্দিন পছন্দ করেন না তা আজ সকলেরই জানা। যেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা বড় না হয়ে ওঠাই দরকার। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই? তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ না হয় কাল সঞ্জয় মঞ্জরেকার ভারতীয় দলে আবার ফিরে আসবেনই। এক সময়ে তিনি ভারতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তা বোধহয় আর হবে না।

থাক ও সব কথা। আমরা এখন বরং একবার ভারত-শ্রীলঙ্কার টেস্ট খেলার রেকর্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই।

ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার এ পর্যন্ত ৮টি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে ৩টিতে, হেরেছে ১টিতে, বাকী ৪টি টেস্টের মীমাংসা হয়নি।

দু দলের অধিনায়ক

১৯৮২ সাল—ভারতের সুনীল গাভাসকার; শ্রীলঙ্কার বি ওয়ার্নাপুরা

১৯৮৫ সাল—ভারতের কপিলদেব; শ্রীলঙ্কার আর ডি মেনডিস

১৯৮৬-৮৭ সাল—ভারতের কপিলদেব; শ্রীলঙ্কার দিলীপ মেনডিস

১৯৯০-৯১ সাল—ভারতের আজহারউদ্দিন; শ্রীলঙ্কার এ রণতুঙ্গে

শতরান

ভারতের পক্ষে:

১৯৯	আজহারউদ্দিন	প্রথম টেস্ট	কানপুর	১৯৮৬-৮৭
১৩১	মহিন্দার অমরনাথ	দ্বিতীয় টেস্ট	নাগপুর	১৯৮৬-৮৭
১১৬*	মহিন্দার অমরনাথ	তৃতীয় টেস্ট	ক্যান্ডি	১৯৮৫
১৭৬	সুনীল গাভাসকার	প্রথম টেস্ট	কানপুর	১৯৮৬-৮৭
১৫৫	সুনীল গাভাসকার	প্রথম টেস্ট	মাদ্রাজ	১৯৮২
১৬৩	কপিলদেব	প্রথম টেস্ট	কানপুর	১৯৮৬-৮৭
১১৪*	সন্দীপ পাটিল	প্রথম টেস্ট	মাদ্রাজ	১৯৮২
১৬৬	দিলীপ বেংসরকার	তৃতীয় টেস্ট	কটক	১৯৮৬-৮৭
১৫৩	দিলীপ বেংসরকার	দ্বিতীয় টেস্ট	নাগপুর	১৯৮৬-৮৭

শ্রীলঙ্কার পক্ষে:

১১১	অমল সিলভা	দ্বিতীয় টেস্ট	কলম্বো	১৯৮৫
১০৬	রয় ডায়াস	তৃতীয় টেস্ট	ক্যান্ডি	১৯৮৫
১০৩	আর এস মাদুগলে	প্রথম টেস্ট	কলম্বো	১৯৮৫
১০৫ ও ১০৫	দিলীপ মেনডিস	প্রথম টেস্ট	মাদ্রাজ	১৯৮২
১২৪	দিলীপ মেনডিস	তৃতীয় টেস্ট	ক্যান্ডি	১৯৮৫
১১১	অর্জুন রণতুঙ্গে	প্রথম টেস্ট	কলম্বো	১৯৮৫

* অপরাজিত

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন রান

ভারতের পক্ষে:

৭ উইকেটে ৬৭৬, প্রথম টেস্ট, কানপুর, ১৯৮৬-৮৭

১৯৮ দ্বিতীয় টেস্ট কলম্বো ১৯৮৫

শ্রীলঙ্কার পক্ষে :

৪২০ প্রথম টেস্ট, কানপুর, ১৯৮৬-৮৭

৮২ চণ্ডীগড় ১৯৯০-৯১

একটি টেস্টে সর্বাধিক উইকেট

ভারতের মনিন্দর সিং—১০৭ রানে ১০টি উইকেট, দ্বিতীয় টেস্ট, নাগপুর ১৯৮৬-৮৭

শ্রীলঙ্কার রুমেশ রত্নায়েকে—১২৫ রানে ৯টি উইকেট, দ্বিতীয় টেস্ট, কলম্বো ১৯৮২

ভারতের ক্রিকেটাররা যেমন শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাচ্ছেন তেমনি টেনিস খেলোয়াড়রা চলেছেন ফ্রান্সে ফরাসি দলের সঙ্গে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় ওয়ার্ল্ড গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে। কলকাতার সাউথ ক্লাবের ঘাসের কোর্টে রমেশ কৃষ্ণণ আর লিয়েন্ডার পেজের হাত ধরে ভারত হারিয়েছিলো গত বারের ফাইনালিস্ট সুইজারল্যান্ডকে। ঐ জয় ভারতের সুনাম অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার সেই সুনাম ধরে রাখার লড়াই। এই মাসে অর্থাৎ জুলাই মাসের মাঝামাঝি ফ্রান্সের সঙ্গে খেলা হবে। ফরাসি খেলোয়াড়রা নিজেদের দেশে খেলবেন। খেলাও হবে ক্লে কোর্টে। ঘাসের কোর্ট হলে লিয়েন্ডার-রমেশের কিছুটা সুবিধে হতো। কিন্তু তা তো আর হবে না। ফ্রান্সে খেলা বলে ফরাসি খেলোয়াড়দের পছন্দমতো কোর্টেই খেলা হবে।

সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় ভারত ছিলো আন্ডারডগ। এবারও তাই। তবে এবার আর অঘটন ঘটবে বলে মনে হয় না। কারণ পাওয়ার টেনিসের দুরন্তপনার সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কতোটা মানিয়ে নিতে পারবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার কারণও আছে। রমেশের বয়েস ৩২। বয়সের ভার তাঁর খেলার ধার অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। ঘাসের কোর্টে তাঁর শৈল্পিক খেলার বিকাশ আমরা কলকাতায় দেখেছি। ক্লে কোর্টে রমেশ তা পারবেন বলে মনে হয় না। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে ভারতের ভরসা একমাত্র লিয়েন্ডারই। লিয়েন্ডারের সম্পদ হলো অনমনীয় দৃঢ়তা, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর লড়াকু মনোভাব। লিয়েন্ডারের উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। লিয়েন্ডারের ঝোঁকও পাওয়ার টেনিসের দিকে। সে শক্তি এবং সামর্থ্য তাঁর খানিকটা আছে। তাঁর সার্ভ ভালো, কিন্তু আরো ভালো অর্থাৎ জোরালো হওয়া দরকার। ভলি মারেন চমৎকার। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যাক হ্যান্ড রিটার্ন দুচোখ ভরে দেখার মতো। ভারতের আশা-ভরসা এখন তাই লিয়েন্ডারই। ফরাসি খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে লিয়েন্ডার কেমন খেলেন সেইটাই এখন দেখার।

এদিকে কলকাতার ফুটবলের অবস্থা শোচনীয়। এখনো লীগের খেলাই আরম্ভ হয়নি। প্রত্যেক বছর মে মাসের কুড়ি-একুশ তারিখের মধ্যে লীগের খেলা শুরু হয়ে যায়। মে মাসের শেষে আর জুনের গোড়ায় বড় দলগুলো এক এক করে মাঠে নামে। এবার কিন্তু সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। ফুটবল খেলোয়াড়দের

ভারতীয় ক্রিকেট দলের মাঠ প্রদক্ষিণ

দলবদল কি কোনোদিন এতো দেরি করে হয়েছে? মনে তো পড়ে না। অন্তত বছর পঁচিশ-তিরিশ যে হয়নি তা আমি হলপ করে বলতে পারি। আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে ১৮৯৩ সালে আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছিলো। এবং পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে শুরু হয়েছিলো লীগের খেলা।অর্থাৎ শতবর্ষের আলোয় আলোকিত এই দুটি প্রতিযোগিতা। আসলে ফুটবল খেলাটাই শুরু হয়েছিলো কলকাতায়। তাই আজও জাতীয় ফুটবল বলতে কলকাতাকেই বোঝেন সকলে। কলকাতাই ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। কিন্তু গত কিছু বছর ধরে কলকাতার ফুটবল তার সুনাম হারাচ্ছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাতেও বাংলা তেমন সুবিধে করতে পারছে না। আর এবার তো একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। শতবার্ষিকী ফুটবল-টুটবল হচ্ছে। কিন্তু আসল যে খেলা সেই লীগ ফুটবলই যে শুরু হলো না। অথচ জুলাই মাস গড়িয়ে যাচ্ছে। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়বে পড়বে করছে। সত্যি ভালো লাগে কখনো? মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান তাদের লীগের খেলা শুরু না করলে কলকাতার ফুটবল কি জমে? তাই এবার ময়দান আর কিছুতেই মেতে উঠছে না। সেইজন্যে বিল্টু-মন্টু, নন্টে-ভন্টে কারো মনই ভালো নেই। এমন কি সেজদাদু পর্যন্ত রাগ-টাগ করছেন না। তিনি এত বিরক্ত। কলকাতার ফুটবলের অবস্থা যে এই রকম হবে তা বোধহয় কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। তাই শঙ্করকাকু এলেও বিল্টু-মন্টুরা আর মাঠে যাবার কথা বলে না। সত্যি তো, মাঠে গিয়ে হবেটাই বা কি! কোথায় বিজয়ন, বাইচুংদের খেলা দেখবে তা না শুধু বসে বসে দিন গোনা— কবে লীগের খেলা শুরু হবে। অন্য বছর হলে তো এই সময় বড় খেলাগুলোর অনেকগুলোই হয়ে যেতো। লীগ চ্যাম্পিয়ন কে হবে সে চিত্রও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যেতো। কিন্তু এবার সব কিছুই গোলমেলে।

বিশ্ব কাপের তোড়জোড়

মাঝে আর মাত্র এক বছর তারপরই আমেরিকায় শুরু হবে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে কারা খেলবে তা ঠিক করার জন্যে সারা বিশ্ব জুড়ে এখন চলেছে প্রাক বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ভারতও খেলছে। তবে ভারতের যে আমেরিকায় খেলতে যাবার কোনো চান্সই নেই সে কথা বোধহয় সকলেই জানেন। তবে প্রাক বিশ্ব কাপে খেলার দরকার ছিলো। কারণ ভারতে ফুটবল খেলা হয় এই কথাটাই বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ ভুলে যেতে বসেছিলেন।

সে যাই হোক আমেরিকায় এখন জোর কদমে বিশ্ব কাপের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আমেরিকার মানুষ ফুটবলের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন বাস্কেটবল আর রাগবি খেলা। বিশ্ব কাপের দায়িত্ব পাবার জন্যে আমেরিকাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে

হয়েছে। এরপর যদি মাঠে ভিড় না হয় তাহলে তো উদ্যোক্তারা মুখ দেখাতে পারবেন না। তাই ফুটবলের বাদশা পেলেকে তাঁরা নামাচ্ছেন প্রচারের জন্যে। ওদিকে বেন জনসন অ্যাথলেটিকসের আসর থেকে চিরকালের জন্যে নির্বাসিত হবার পর এখন ফুটবল খেলবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর ইতালির কোনো ক্লাবের হয়ে খেলার ইচ্ছে। ইতালির কোনো ক্লাব বেন জনসনকে এখনো না ডাকলেও কয়েকটি মার্কিন ক্লাব কিন্তু ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে জনসনের সঙ্গে। তবে কোথায় খেলবেন সেই সিদ্ধান্ত জনসন এখনো পাকাপাকিভাবে নেননি।

বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় দিয়েগো মারাদোনার ইচ্ছে আসছে বছরের বিশ্ব কাপে নিজের দেশ আর্জেনটিনার পক্ষে খেলার। মারাদোনা যে খেলবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মারাদোনার সময়টা এখন মোটেই ভালো যাচ্ছে না। খেলতেও পারছেন না ভালো। ১৯৯২ সালে শাস্তিমুক্ত হবার পর মারাদোনা স্পেনের সেভিলে খেলতে আসেন। এইজন্যে সেভিল তাঁকে ৫০ লক্ষ পাউন্ড দিয়েছে। টাকার হিসেবে এক পাউন্ডের দাম এখন পঞ্চাশ টাকারও বেশি। এইবার টাকার হিসেবটা কষে নিলেই বোঝা যাবে মারাদোনা কতো কোটি টাকা নিয়েছেন। কিন্তু ঠিকমতো খেলতে পারছেন না তিনি। এই বছরের মে মাস পর্যন্ত মারাদোনাকে দু দুবার ফাইন দিতে

হয়েছে। গত ১৩ মার্চ কথা না শোনার জন্যে সেভিল ১৩০০০ স্টার্লিং পাউন্ড ফাইন করেছিলো। এর পর ২৭ এপ্রিল স্প্যানিশ ফুটবল লীগ কমিটির নির্দেশ সত্ত্বেও শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সভায় হাজির না হওয়ার জন্যে মারাদোনাকে ২৫০০০ পাউন্ড ফাইন করে। এখানেই শেষ নয়, গত ১৩ মে ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে ঘণ্টায় ১০০ মাইল স্পিডে গাড়ি চালানোর অপরাধে ধরা পড়েন মারাদোনা। ফাইন দিয়ে তাঁকে মান বাঁচাতে হয়। সব কিছুই মাপ হয়ে যেতো যদি মারাদোনা ভালো খেলতে পারতেন। তা তিনি পারছেন না বলেই যতো গোলমাল। সব মিলিয়ে এই বছরটা মারাদোনার মোটেই ভালো যাচ্ছে না। গত জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে সেভিলের পক্ষে খেলতে নেমে রেফারির সঙ্গে তর্ক করার জন্যে মারাদোনাকে লাল কার্ড দেখতে হয়েছিলো। খারাপ সময়ের সেই শুরু। শেষ কোথায় কে জানে?

ফুটবল খেলতে হলে

জর্জ রেনর

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর)

হাফ ভলি বা ড্রপ কিক অনুশীলনের একটি ভালো উপায় হলো হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে দেওয়া এবং বলটি মাটিতে পড়ার মুহূর্তে এক নম্বর ছবির মতো করে নির্দিষ্ট দিকে মারা। থ্রো ইন থেকেই পায়ের মধ্যভাগ দিয়ে হাফ ভলি মারার অনুশীলন করাই সবচেয়ে ভালো। থ্রো ইন থেকে বলটি যে কিক করবে তার পায়ের ওপর ফেলতে হবে। সে পায়ের পুরো মধ্যভাগ দিয়ে বলটা ধরবে। শরীর থাকবে প্রায় বলের ওপর, যাতে দরকার হলে বলটা সে গড়িয়ে ফেরত দিতে পারে। তবে বলটা যদি উঁচু করে মারতে হয় তাহলে কিককারীর শরীর বলটি থেকে অর্থাৎ যে স্থানে বলের সঙ্গে পায়ের সংঘর্ষ ঘটবে সেই স্থান থেকে দূরে থাকবে। বলটিও স্কুপ করে মারতে হবে।

১নং

ছোট ছোট পাসের মাধ্যমে খেলার ক্ষেত্রে 'পুস' বা ঠেলে দেওয়া একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যদি গড়িয়ে পাস দিতে হয় তাহলে যে পা দিয়ে বল মারা হবে না সেই পা-টি বলের কাছে রাখতে হবে এবং উঁচু করে দিতে হলে পা-টি একটু পিছিয়ে থাকবে।

কিক করে মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠানো বা 'ওভার-হেড কিক' রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের একটি অতিপ্রয়োজনীয় অস্ত্র। অনেক সময়ই দেখা যায় খেলোয়াড়টি নিজের গোলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ণার বা থ্রো যাতে না হয় সেদিকে নজর দিয়ে সে তখন বলটি মাথার ওপর দিয়ে কিক করে বিপদ সীমার বাইরে পাঠাতে পারে। এইভাবে কিক করতে হলে যে পা দিয়ে বলটি মারা হচ্ছে না সেই পা-টি অপর পা থেকে অর্থাৎ পা ও বলের সংযোগস্থল থেকে এক পদক্ষেপ দূরে থাকবে। কিককারীকে পা-টি সোজা করতে হবে। এবং পায়ের ওপর ছবির মতো করে বলটি নিতে হবে। পায়ের টো আস্তে আস্তে বেঁকে আসবে এবং অপর পা-টি হাঁটু থেকে ভেঙে বেঁকে যাবে। শরীরটা পুরোপুরি পেছন দিকে হেলে যাবে। বলটি মারার পর খেলোয়াড়টি পেছন দিকেই হেলে পড়বে এবং হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে খেলোয়াড় তার পতন রোধ করবে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রাও গোলের উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে যাতে লাফানো বল ঐ ভাবে মেরে গোল করতে পারে।

পরের মাসে তোমাদের বল ট্র্যাপ করার কায়দা শিখিয়ে দেব।

২নং

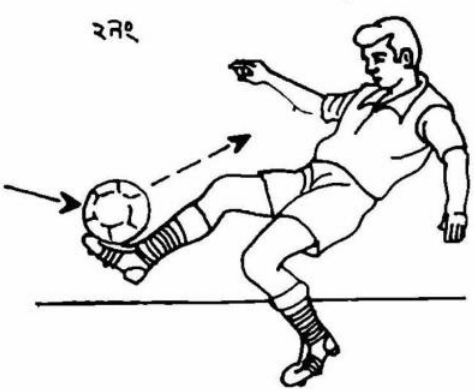

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্নঃ

(১) ম্যালকম ন্যাসের এক ওভারের ছ বলে ছটি ছয় মেরেছিলেন গ্যারি সোবার্স। আরো একজন খেলোয়াড় এক ওভারের ছ বলে ছটি ছয় মারার কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর নাম কি, কোথায়, কোন খেলায় তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন? বোলার কে ছিলেন?

(২) টেস্ট খেলায় একদিনে তিনশর ওপর রান করেছেন কি কেউ? করে থাকলে তাঁর নাম কি, কোথায়, কার বিরুদ্ধে?

(৩) উইম্বলডনের বাছাই তালিকায় কোন ভারতীয় সর্বপ্রথম স্থান পান?

(৪) উইম্বলডনের ডবলসের খেলায় কোনো ভারতীয় জুটি কি সেমিফাইনালে উঠেছিলেন? উঠে থাকলে তাঁদের নাম কি, কোন সালে?

(৫) কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের ফাইনালে খেলেছিলেন, পরে তিনিই আবার খুনের অপরাধে শাস্তি পেয়েছিলেন?

(৬) উইম্বলডনে মোট কটি কোর্ট আছে? ঘাসের কোর্টের সংখ্যাই বা কতো?

(৭) কোন দুটি দেশের মধ্যে টেস্ট লড়াই হয় যার পুরস্কার উইসডেন ট্রফি?

(৮) কপিলদেবের হিরো ক্রিকেটার কে?

(৯) ১৯৫৬ সালে বাংলার একজন ক্রিকেটার রনজি ট্রফিতে এক ইনিংসে প্রতিপক্ষ দলের দশটি উইকেট দখল করেছিলেন—তাঁর নাম কি?

(১০) ভারতের কোন ক্রিকেটার পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন?

উত্তরঃ

(১) রবি শাস্ত্রী। ১৯৮৪-৮৫ সালে বোম্বাইএ রনজি ট্রফিতে বোম্বাই-এর সঙ্গে বরোদার খেলায়। বোলার ছিলেন তিলকরাজ।

(২) করেছেন। ডন ব্রাডম্যান। ১৯৩০ সালে লিডসের প্রথম টেস্টে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। প্রথম দিনেই ৩০৯ রান করেছিলেন।

(৩) দিলীপ বসু।

(৪) উঠেছিলেন। বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ। ১৯৭৬ সালে।

(৫) ডি. এস. গোল্ড। ১৮৭৯ সালে উইম্বলডনের ফাইনালে খেলেছিলেন। পরে শাস্তি পেয়েছিলেন খুনের অপরাধে।

(৬) ২৫টি এবং ১৫টি।

(৭) ইংলন্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে।

(৮) একজন নন, তিন জন—গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, ভিভ রিচার্ডস আর মাইকেল হোল্ডিং।

(৯) পি. সি. চ্যাটার্জি।

(১০) সি. কে. নাইডু।

উক্তি

আমাদের যথেষ্টসংখ্যক কোচ নেই, আমাদের পর্যাপ্ত কোর্ট নেই, এমনকি আমাদের যথেষ্ট বলও নেই। তবু আমাদের দেশে টেনিস খেলা হয়। আমরাও উঠে আসি।

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে) —বিজয় অমৃতরাজ

আমার জীবনের সব থেকে মজার মুহূর্ত কোনটি জানো? সেদিন স্কুলের খেলায় আমি আর বিনোদ কাম্বলি ব্যাট করছিলাম। তখন আমার স্ট্রাইক....হঠাৎ আমি দেখি মাটিতে ব্যাট রেখে দিয়ে বিনোদ ঘুড়ি উড়োচ্ছে। তাই দেখে আমিও নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। ছুটে গিয়েছিলাম।

(নিজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে) —শচীন তেণ্ডুলকার

আমায় নিশ্চয়ই এখন কেউ আর শচীনের পার্টনার বলে উল্লেখ করে না। আমি বিনোদ কাম্বলি নামেই পরিচিত হতে চাই। শুধু শচীনের বন্ধু হিসেবে নয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুত্ব একটু অন্য রকম। হাজার হলেও স্কুলে ছোট্ট থেকে আমরা বন্ধু তো। আচরেকার স্যারের কাছে আমি যখন খেলা শুরু করি তখন আমার বয়স দশ। শচীন যখন এলো তখন ও এগারোয় পড়েছে। এই তো সেদিনের কথা এ সব।

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে) —বিনোদ কাম্বলি

তোমাদের জিজ্ঞাসা

কৌস্তুভ মণ্ডল (জয়পুর, বাঁকুড়া)

উত্তরঃ কপিলদেবের ছেলেবেলার কথা যেবার ছাপা হয়েছে সেইবারই তো তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছো।

উত্তম অধিকারী (বারাতলা, বাহিরকুণ্ড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

উত্তরঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর তো এই সংখ্যাতেই আছে। দেখেছো তো?

দেবব্রত ধর (c/o নিরঞ্জন ধর, ফারাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্নঃ আজহারউদ্দিনের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ হায়দারাবাদে অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার ঠিকানায় চিঠি লিখলেই উনি পেয়ে যাবেন।

পুলক দাস (লঙ্কা, নাওগাঁও, অসম)

প্রশ্নঃ পরবর্তী বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কোথায় হবে?

উত্তরঃ ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কায়।

পল্লবকুমার নিয়োগী (বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, হুগলি)

প্রশ্নঃ ১৯৯৪ সালের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় হবে?

উত্তরঃ আমেরিকায়।

ক্লাব পরিচিতি

ফেয়ানর্ডঃ ক্রুয়েফের ক্লাব

সুমন ভট্টাচার্য

অ্যাজাক্সের নামের পাশে চাপা পড়ে গেলেও ডাচ ফুটবলের অন্যতম বড় শক্তি ফেয়ানর্ড। ফেয়ানর্ড ক্লাবের ইতিহাস ৫০ বছরের পুরনো, যদিও তাদের সাফল্যের শুরু ১৯৫৪ সালের পর থেকে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাজাক্সের থেকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এরা এগিয়ে। সে দেশের ভেতর সাফল্যের জন্যই হোক বা দেশের বাইরে সাফল্যের জন্যেই হোক।

ফেয়ানর্ডই প্রথম ডাচ ক্লাব হিসাবে ইউরোপীয়ান কাপ জেতে ১৯৭০-এ। ফাইনালে তারা স্কটল্যান্ডের সেলটিককে হারায়। ইতালীর মিলানে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নির্দিষ্ট সময় অব্দি ফলাফল ১-১ থাকলেও অতিরিক্ত সময়ে জিতে যায় ওড কিণ্ড-ডালসের করা গোলে (২-১)। ঐ বছরই তারা বিশ্বক্লাব কাপে খেলার সুযোগ পায় এবং সেখানেও ক্লাবের সাফল্য অব্যাহত রাখে। আর্জেন্টিনার এস্টুডিয়ন্স ডিলা-প্লাটাকে হারায় হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে পদ্ধতির খেলায়। প্রথম খেলায় ফলাফল থাকে ২-২ এবং দ্বিতীয় দফায় ১-০।

১৯৭৪-এ আবার তারা সাফল্যের স্বাদ পেতে থাকে। সে বছর তাদের দলের মূল আকর্ষণ ছিলেন উইম ভ্যান হিন্সসেন। তাঁই কৃতিত্বে ডাচ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে এবং উয়েফা কাপে খেলার সুযোগ পায়। উয়েফা কাপেও তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখে তারা ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ডের টটেনহাম হস্কারের। প্রথম দফায় ফল হয় ২-২। দ্বিতীয় সাক্ষাতে ২-০। ফলে উয়েফা কাপ ফেয়ানর্ডের ঘরে আসে।

ফেয়ানর্ডের বিখ্যাত প্রশিক্ষক ছিলেন আর্নস্ট হ্যাগেল। তাঁর আমলে ফেয়ানর্ড উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছায়। পরবর্তীকালে হ্যাগেল জাতীয় দলেরও প্রশিক্ষক ছিলেন। ফেয়ানর্ড ছিল ডাচ ফুটবলের চিরাচরিত টোটাল সিস্টেম ফুটবলের শৈলী এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের খেলায় বিশ্বাসী। হ্যাগেল দলকে সেইভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

আশির দশকে ফেয়ানর্ড আবার সাফল্য পেতে থাকে। ১৯৮৩-তে তাদের দলের অন্যতম স্ট্রাইকার ইউরোপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান অ্যাডিডাস কোম্পানীর কাছ থেকে। হাউটম্যান ঐ মরশুমে ৩০টি গোল করে ঐ সম্মান পান। পরবর্তী বছরে, অর্থাৎ ১৯৮৪তে বিখ্যাত ডাচ তারকা, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় যোহান ক্রুয়েফ তাদের দলে খেলতে আসেন। ঐ বছরই তাদের দীর্ঘদিনের খরা মিটে যায়। আবার লীগ ও কাপ জিতে ডাবল করে।

ফেয়ানর্ড ডাচ তথা ইউরোপের ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়সমৃদ্ধ অন্যতম সেরা দল। বর্তমান ডাচ দলের গোলরক্ষক জুপ জিলও ফেয়ানর্ডে খেলেন। ফেয়ানর্ড তাই বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম বড় শক্তি সর্বদাই।

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের সত্ত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতা নির্মল সাহা স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাবমতো নির্মল সাহা সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

নির্মল সাহা

জন্মঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪৬
মৃত্যুঃ ১৬ ভাদ্র, শনিবার ১৩৮৫

বিষয়বস্তু

ঝর ঝর বারি বরিষণে

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ আশ্বিন।
পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার পৌষ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কারঃ ১০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৫০ টাকা

সৌজন্যেঃ আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন
১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০০১৯

পলতা স্টেশনে নেমে রিকশায় উঠে নবাবগঞ্জ হাই স্কুলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল বইয়ের 'ঠিকানা' কবিতার মতো তিন চারটে গলি ডাইনে বাঁয়ে মোচড় মেরে এলাম বাদামতলা। সেখান থেকে আরও খানিক এঁকে-বেঁকে নবাবগঞ্জ হাই স্কুলে পৌঁছালাম।

জায়গাটির নামকরণের পিছনে একটা ইতিহাস আছে। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে নবাব সিরাজদৌল্লা যখনই কলকাতায় আসতেন প্রতিবারই এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন ও রাতটা কাটাতেন। নবাবের আমল থেকে এখনো পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার নিয়মিত এখানে হাট বসে। মিউনিসিপ্যালিটি এই হাটকে বাজারে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। দেখা গেছে ঐ দুটি দিন ছাড়া অন্য দিনে কেউ বাজার হাট করতে আগ্রহী নন। তাই নতুন পরিকল্পনা বাতিল হয়ে আবার আগের মতন সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। নবাবের আগমন ও হাটের ঐতিহ্য

পড়ার সঙ্গে খেলা

নবাবগঞ্জ হাই স্কুল

মিহির দাশ

দুটিকে একত্রিত করে এলাকার নামকরণ হয়েছে নবাবগঞ্জ। এলাকার নাম অনুসারে স্কুলেরও নাম রাখা হয় নবাবগঞ্জ হাই স্কুল।

নওয়াপাড়ার বিধায়ক মদনমোহন নাথ হলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন, বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত। সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। ১৯৭১ সালে নবাবগঞ্জ হাই স্কুল স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে পড়াশুনা ও খেলাধূলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অভিভাবক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। বিদ্যালয়টি কো-এডুকেশন। মোট ৭৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করে। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি বছর বহু ছাত্র-ছাত্রী ৬০০-র উপর নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হচ্ছে। এই স্কুলের ছাত্র রাজীব নিয়োগী '৯০ সালে মাধ্যমিকে ৭১০ নম্বর পায়। এ ছাড়া সঞ্জয় সরকার (৬৫৮), জিষ্ণু রায় (৬৫০), শুকদেব মারিক (৬৪৬), কল্পনা সিকদার (৬৩৩), আশিস নাথ (৬৩১) প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। এ বছর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে যারা চিহ্নিত তারা হলো সৌগত মজুমদার, শমিষ্ঠা পাই, মণিমালা সিকদার প্রমুখ।

পড়াশুনার সঙ্গে সমান তালে চলে খেলাধূলা। খেলার মাঠে শারীরশিক্ষক অমিত সমাদ্দার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো

ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বাঙ্গালোরে শারীরশিক্ষার ট্রেনিং নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি পেয়েছেন। অমিত সমাদ্দারের প্রশিক্ষণে স্কুলের নিজস্ব খেলার মাঠে নিয়মিত চলে ফুটবল, কাবাডী ও খো-খোর অনুশীলন। স্কুলের পাশে একটি ছোট ডোবা ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিতায় মাটি এনে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে হাত লাগিয়ে ঐ জমি ভরাট করে খেলার মাঠের উপযুক্ত করে তোলে।

ইন্টার জোনাল স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই স্কুল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছয়। প্রতিযোগী স্কুলের সংখ্যা ছিল মোট চব্বিশ। ইস্টবেঙ্গল দলের উনিশ বর্ষীয় ফুটবলার লাল মহম্মদ এই স্কুলের ছাত্র। ভারতের সাব-জুনিয়ার দলের হয়ে লাল বিদেশ সফর করে। বিদেশ সফরকালে লাল মহম্মদ ৩টি গোল করেছে। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ২টি ও কাতারের বিরুদ্ধে ১টি। বর্তমানে প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার হিসেবে যারা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে তারা হলো শিশির ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও সুমিত দেবনাথ। এ ছাড়া দুই ছাত্র বাবুল চৌধুরী ও তারক চৌধুরী বাংলা অ্যাথলিট দলে সুযোগ পায়। সুস্মিতা দে ও রুমা রায় অ্যাথলেটিকসের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য নাম।

খো-খো আর কাবাডী খেলাও হয় জোর কদমে। এশিয়াডে সোনাজয়ী কাবাডী দলের সদস্য আনজার আলি এই অঞ্চলের ছেলে। আনজারের সাফল্য দেখে বহু ছাত্র-ছাত্রী কাবাডী খেলায় মেতে উঠেছে। খো-খো খেলাতেও বাংলার মধ্যে এই অঞ্চলের যথেষ্ট সুনাম আছে। তাই জেলাস্তরের বেশ কিছু কাবাডী আর খো-খো খেলোয়াড় এই স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রী।

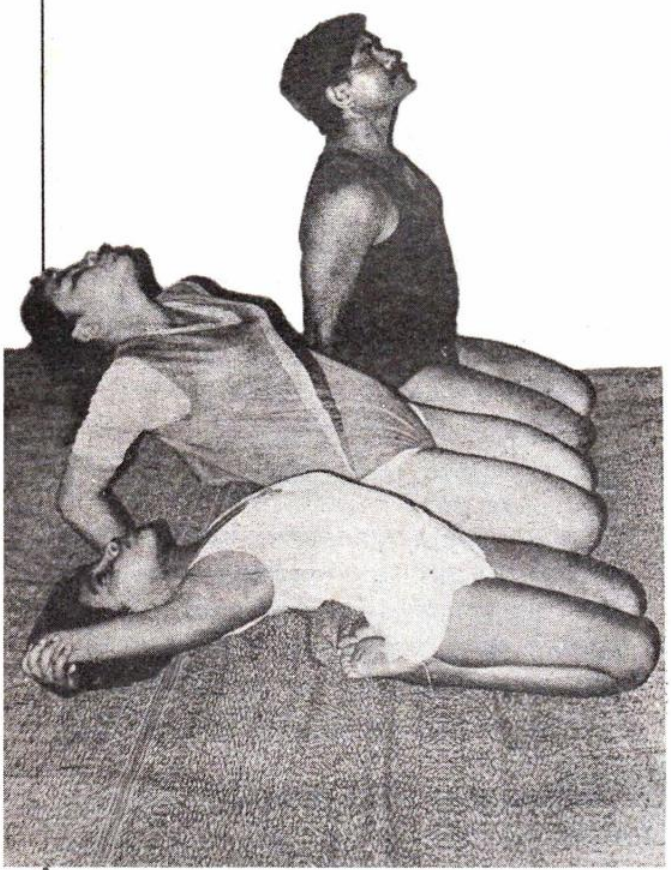

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

সুপ্ত বজ্রাসন

বর্ষাকাল। খাদ্যের একটু এপাশ ওপাশ হলেই পেট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতে হয়। আর পেট খারাপ তো মন খারাপ। কোনো কাজেই তখন মন বসে না। মেজাজও হয়ে যায় খিটখিটে। তাই এই সময় খাওয়া-দাওয়াটা একটু সাবধানে করা উচিত। যারা প্রায়ই পেটের গণ্ডগোলে ভোগো পারলে তারা জলটা ফুটিয়ে খেও।

আজকে যে ব্যায়ামটা শেখাব, সেটা নিয়মিত করলে হজম-শক্তি বাড়বে, তাছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্বল, অজীর্ণ, হাঁটু ও পায়ের বিভিন্ন বাতজনিত ব্যথা সারতে সাহায্য করবে। যাদের পা খুব কামড়ায় বা হাঁটাহাঁটি ও দৌড়োদৌড়ি করলে কোমরে কষ্ট হয় তারা এই আসনটা করবে। তোমাদের জানা কেউ সায়াটিকা ও বাতজনিত কোমরের ব্যথায় কষ্ট পেলে তাঁদেরও এই ব্যায়ামটা শিখিয়ে দিও। বয়স বেশি হলে তাঁদের ধীরে ধীরে করতে বল।

এই ব্যায়াম কোমর ও পেটে মেদ কমিয়ে শরীরকে করবে লাবণ্যময়। বুকের খাঁচার গঠনের দোষও সারাতে সাহায্য করে।

যোগ ব্যায়ামটার নাম সুপ্ত বজ্রাসন। আসনটার নামের ভিতরেই করার ঢঙ লুকিয়ে আছে। ছবির সামনের ছেলেটি যেভাবে শুয়ে রয়েছে তা হলো সুপ্ত বজ্রাসন। কিন্তু ঐ অবস্থানে আসতে গেলে প্রথমে বজ্রাসনে বসতে হবে। ছবির শেষ ছেলেটি প্রায় বজ্রাসনে বসে আছে। দু'পা মুড়ে পায়ের পাতার পিঠ জমিতে রাখ। দু'পায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পরের সঙ্গে লাগান থাকবে। দু গোড়ালি অল্প ফাঁক করে, গোড়ালিদ্বয়ের ফাঁকের উপর নিতম্ব বা পাছা রেখে সোজা হয়ে বস। দু' হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে। যখন শুধু বজ্রাসন করবে, তখন ডান হাঁটুর উপর ডান হাত এবং বাঁ হাঁটুর উপর বাঁ হাত রাখবে। এইবার হাত দুটো ছেলেটির মতো পিছনদিকে নিয়ে তালু দুটো মাটিতে পেতে দাও।

হাতের আঙুলগুলো সামনের দিকে থাকবে। এইবার মাঝখানের মেয়েটির মতো পিছন দিকে হেলে দু'কনুই ভাঁজ করে মাটিতে লাগিয়ে দাও। তারপর শুয়ে পড় সামনের ছেলেটির মতো। হাত দুটি ঘুরিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এসে এক হাত দিয়ে অপর হাতের কনুই ধরে নাও। খেয়াল থাকে যেন হাঁটু দুটো জমি থেকে উঠে না যায়। প্রতি মাত্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১০/১৫ বা ততোধিক সেকেন্ড থাক। এই ভাবে ২/৩ মাত্রায় অভ্যাস কর। প্রতি মাত্রার মাঝে ১০/১৫ বা ২০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নাও।

সুপ্ত বজ্রাসন অবস্থা থেকে কিভাবে বিশ্রাম অবস্থায় আসবে, জেনে রাখা ভাল। যে কোনো দিকে পাশ ফিরে যাও, দেখবে পা খুলে গেছে, অর্থাৎ সোজা হয়ে গেছে। কখনই সুপ্ত বজ্রাসন অবস্থান থেকে উঠে বসবার চেষ্টা করবে না, কারণ এতে চোট লেগে যেতে পারে। প্রথম প্রথম সুপ্ত বজ্রাসন করতে গেলে পায়ের গোড়ালিতে খুব কষ্ট হয়। যাদের এই কষ্ট অত্যধিক হবে, তারা মাঝের মেয়েটির অবস্থানে এসে ঐ অবস্থানেই থাক। দেখবে এই ভাবে করতে করতে তুমিও সুপ্ত বজ্রাসন শিখে গেছ।

॥ নতুন ধাঁধা ॥

১। পাখা নেই উড়ে যায়
মুখ নেই ডাকে,
বুক ফেটে আলো ছোটে
কান ফাটে হাঁকে।

—রাজু সাধুখাঁ
হীরাপুর/হাওড়া

গরম গরম পেলে ভাই
যত খুশি খেতে চাই।
পাটি ছাড়া ঘোড়ার ডিম?
কিংবা গাছের কন্দ।
মাথা কেটে অপহরণ
নেই তাতে সন্দ।

—রনসু দাস জিতু
চকবাজার/বাঁকুড়া

ডুব দিয়ে দিয়ে চলি
হুল ফুটিয়ে কথা বলি
শূল উঁচিয়ে যাই
নামটি বলা চাই।

—প্রণব মণ্ডল
দুর্গাপুর

বোবা কালা আগাগোড়া
গোড়া হলো আগা ছাড়া।

—অপরূপা নন্দী
কুমরডি/পুরুলিয়া

আষাঢ় সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ
১ [illegible] ২। কোলাহল ৩। লেখক ৪। মরম

আষাঢ় সংখ্যার শব্দমালার উত্তর :

কোণাকুণি নিচে :
১। তিতিক্ষা ৪। নক্ষত্রপতি ৬। অপরিসর ১০। মনোনিবেশ ১৯। আবোল তাবোল ২৩। ইঞ্জিনীয়ার ২৫। বীপ্সা

কোণাকুণি পাশে/উপরে :
২। তিত্তির ১০। শরবৎ ২৩। ইতিহাস

পাশাপাশি :
৩। সত্যজিৎ ৫। তিলি ৭। জেরবার ১১। কবিরাজ ১৩। ছোঁয়া ১৪। বন্দে মাতরম ১৭। সত্ত্বা ১৮। লখলাইন ২১। অত্যাগসহন

নিচে :
৩। সত্যানুসন্ধান ৬। অলি ৮। রকমসকম ১২। জড়োয়া ১৫। মাস ১৬। তত্ত্বানুসন্ধান ২০। মহাবিদ্যালয় ২২। সর্বাঙ্গসুন্দর ২৪। নয়নাভিরাম

বলো তো আমি কে?

সূত্র হেঁয়ালি

আমার গল্প তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। আমি কে জানতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখঃ

সূত্র এক : জায়গাটার নাম আমি প্রথম শুনি ভূ-পর্যটক এক সাহেবের কাছে। তিনি বলেন সেখানকার আদিম অধিবাসীরা কোনো বিদেশীকেই নাকি তাদের সেই নগরে ঢুকতে দেয় না।

সূত্র দুই : কাহিনীর মধ্যে ছিল রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত। আমি তখুনি রাজী হয়ে যাই সেই গোপন নগরে যেতে। আমার সঙ্গী হন আরো তিন বাঙালী।

সূত্র তিন : আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতমালার অন্তর্গত একটা বিশেষ পাহাড়। সেখানে পৌঁছুবার আগে আমরা সাক্ষাৎ পাই কালো বাজের।

সূত্র চার : পাহাড়ের ঠিক নিচে তাঁবু ফেলা হয়। গভীর রাতে লোকজন নিয়ে কালো বাজ আসে হামলা করতে। কিন্তু একদল প্রেতের মতো মূর্তি দেখে তারা পালায়।

সূত্র পাঁচ : সকালে অদ্ভুত কিছু রক্তাক্ত পদচিহ্নর সঙ্গে আমরা আবিষ্কার করি কয়েকজন লাল-মানুষকে। একজন ছাড়া বাকি সবাই মৃত। জীবিত লোকটির নাম ইক্‌টিনাইক্‌।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি ধরতে পারো তাহলে বলব অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে হলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র খুব ভালো; চতুর্থ সূত্র ভালো; আর পঞ্চম সূত্র হলে মোটামুটি।

আমার নাম? পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালা

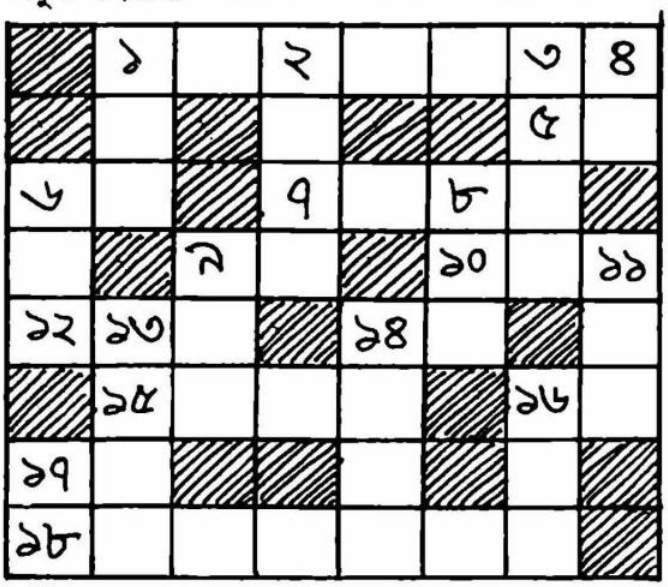

এটি তৈরি করেছেন সারফারাজ নাওয়াজ/বর্ধমান সি.এম.এস হাই স্কুল

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী/নদী ও তার কাণ্ডারী
৫। রাজ্যহারা নিষধরাজ/কলির কোপে পড়ি—
৬। ক্রূর বটে সাপও বটে/অর্থ বলে তাই
৭। ভ্রাতৃহন্তা অশোকে/এ নামে ডাকত সবাই
৯। আত্মপ্রকাশ আরেক অর্থে মাথা – দেওয়া
১০। রসবিহীন বস্তু/যদি 'নী' থাকত মাথায়
১২। লবণের ফারসি শব্দ/কঠিন বেশি নয়
১৪। – যত পথও তত/জেনো তা নিশ্চয়
১৫। তল্লাশ, অনুসন্ধান/যা খুশি তাই বলো
১৬। বিয়ে বাড়ি উলুধ্বনি/ওই বুঝি – এলো
১৭। সাদা নয়, লাল নয়/পাবে তার বিপরীতে
১৮। রূপসী বাংলা কালজয়ী/যে কবির লেখনীতে

উপর নিচঃ

১। কর্দমময়—পথ/বর্ষাকালে দেখি
২। ঘোরাফেরা, চলাচলি/তাকে বলে কী
৩। কদমা বলতে/স্থানটির নাম ভাসে চোখে
৪। জল টইটই বিশাল দীঘি/পাখি আসে উড়ে
৬। অর্থ বলে/এ শব্দটি ব্যাপ্তি বা বিস্তার
৮। একই – বহে দুই দেহে/হিন্দু-মুসলমান
৯। নদীয়ার একটি স্থান/মধুচক্র+দা
১১। যুদ্ধ বা রণ/লোকের নামও হয় তা
১৩। —আঁটিলে/কার্য সিদ্ধি হবেই তো নিশ্চয়
১৫। পুষ্পরস বা ফুলের মধু/শুদ্ধ ভাষায় কয়
১৬। বাড়লে এটি ন্যুব্জ শরীর/জরাজীর্ণ দেহ
১৭। মুসলমান বিচারকের/নাম জানো কি কেহ

ফাল্গুন সংখ্যার বাকি উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ কলকাতা ॥

মণিদীপা দাশ, টুম্পা মান্না ও পেটো ভট্টাচার্য/রাজবাড়ি; মধুপর্ণা, জবা, অনুরাগ, অভিনব, সৌমী, ঐন্দ্রিলা ও শান্তনু/বেহালা; প্রীতিকণা ও অমরেন্দ্রনাথ চম্পটি/গল্ফ গ্রীন; আদানাথ বিশ্বাস/আলিপুর; অরুণিমা ও শীলা মণ্ডল/বেলেঘাটা; বিশ্বনাথ, স্মৃতিকণা ও চন্দনা গোস্বামী/গল্ফ গ্রীন; বাণী, মুন্না, তাপস, তরুণ, গোপাল, বিমল, প্রভা ও রামপ্রসাদ/গড়িয়াহাট মার্কেট; প্রিয়া, স্নিগ্ধা, দেবাশিস ও জ্যোৎস্না সিংহ/ঠাকুরপুকুর; মোনালিসা ও কৌশিক মুখার্জী/সল্টলেক;

॥ হুগলী ॥

বিভাস্মিতা দত্ত/আরামবাগ; রণি, পিউ, জুনি, শৌনক, সায়নী, রূপঙ্কর ও সোমা/মাহেশ; মুনাই, মোম, মন্টি, দেবশ্রী, সমি, তুবি ও পুপাই/ বৈদ্যবাটী; দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/শ্রীরামপুর; শ্যামাপ্রসাদ ও সুপর্ণকান্তি দাশ/কয়াপাট; স্বাতী ব্যানার্জী, সুকুমার নাথ, বিজয় মুখার্জী, বাবুয়া নাথ ও অপর্ণা ব্যানার্জী/শেওড়াফুলী; আত্রেয়ী, কবরী ও অমল রায়/ভদ্রকালী; দুলাল, রুমঝুম, দেবোত্তম ও দেবযানী সরকার/হিন্দ মোটর; পিনাকী, অপর্ণা, কল্যাণ ও অরুণা/ভদ্রকালী; অতীন, সুস্মিতা, অরিজিৎ, অরুণিমা ও অনসূয়া গাঙ্গুলী/বৈদ্যবাটী;

॥ বীরভূম ॥

পাল, মামণি, মিনু ও সোমনাথ/বোলপুর; সুকান্ত মণ্ডল/সিউড়ি;

॥ বাঁকুড়া ॥

ঈশানী, সৈকত ও শুভজিত দে/সোনামুখী; রনসু দাস জিতু, মোনালিসা, বনলতা সেন, শ্রীমতি জ্যোতি, জিকট্যান ডাজ ও প্রভু, ইন্দ্রজিৎ কারপরদাজ/বিষ্ণুপুর; মদন, তরুণ, তপন, মিলন, রবীন, সুমিতা, কেয়া ও মুনু দত্ত/গোপীনাথপুর; মিলটন, কল্লোল, মৌ, বুবাই, অষ্টমী, পার্থ, বৈশাখী ও টুসি খাঁ/মনোহর; প্রণব, প্রসূন, পীযূষ, রমা, মিতা ও হিরন্ময় কর্মকার/বড়জোড়া; অয়ন, পায়েল, লাবণ্য ও অশোক দাস/দোলতলা; বাণী, বন্দনা, শম্পা ও বিটু/প্রতাপ বাগান (নর্থ); সুমন গুপ্ত/রামহরিপুর, রামকৃষ্ণ মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়; তিপ্তি ও মুন্নি দত্ত/কলেজপাড়া, বিষ্ণুপুর; মনোজিৎ ও মৃত্যুঞ্জিৎ দাস/ঝাঁটি পাহাড়ী;

॥ বর্ধমান ॥

সঙ্গীতা পাল, শ্রাবণী দে, শান্তা, দোলা ও মৌসুমী/ দুর্গাপুর; সুমেধা, ঋতুপর্ণা, সুশ্বেতা ও দেবশ্রুতি/বার্ণপুর; শ্যামলী, শান্তনু, পিন্টু, বর্ণালী, রাম্বু, ছোটন, বাণী, সুভাষ ও তরুণ/দুর্গাপুর; বুবুন, জয়শ্রী, লক্ষ্মণ, রীনা, রুবেন ও নিরঞ্জন করগুপ্ত/মেমারী; পলাশ, পারিজাত, ছোটন ও পারমিতা ঘাঁটি/আসানসোল; অভ্রদীপ, অজন্তা ও সোমাংশুশেখর গুহ/দুর্গাপুর-৫; সৈকত, পিউলি ও সঞ্জীবকুমার/অমরারগড়; পার্থপ্রতিম ও মৌসুমী চাটার্জী/কালনা; অয়ন, সমরজিৎ, শান্তি, কান্তি, পিন্টু, সঞ্জয় ও বিকাশ/অন্ডাল; জয়তী নায়ক/আসানসোল; জহর, দীপ্তি, মিলি, তমায় নায়ক/আসানসোল; মায়া ও রুমা মণ্ডল/রানিগঞ্জ; গীতা, রেখা, উর্মি ও রুমি বিশ্বাস/অন্ডাল; ঝন্টু, বিশ্বনাথ, প্রতাপ, পার্থ, টুবলু ও তিমিরবরণ চাঁদ/গুসকরা; মনোরঞ্জন ও অনিমা মোদক, শিখা সোমা, চিত্রা গাঙ্গুলী, সীমা বসাক, ছায়া সাহা, কল্যাণী ঘোষ ও রাম পাল/জালুইডাঙ্গা-সমুদ্রগড়; অভিষেক, অভিরূপ, মল্লিকা, বন্দনা ও দীপান্বিতা/আসানসোল; তিমিরজ্যোতি, মল্লিকা, গৌতম, দেবজ্যোতি, মঞ্জরী, অনন্যা, তারাশঙ্করী ও কালু/কেঁদুড়; রজত, কাঞ্চন, সীমা ও সৌরভ কর্মকার, বিতান গোস্বামী ও কেয়া যশ/ দোমোহানী বাজার; জয়ন্ত, সঞ্চিতা ও সুপর্ণা/ভিড়িঙ্গী; কবিতা ও সংহিতা চৌধুরী/এ. বি. এল. টাউনশিপ; মৌ ও বাপ্পা/আসানসোল; সলিল, ছন্দা, ঝুনঝুন ও সপ্তর্ষি ব্যানার্জী/শাঁখারীপুকুর হাউসিং এস্টেট;

॥ দার্জিলিং ॥

স্নিগ্ধদেব পাল/শিলিগুড়ি; টুবু, মৌ, বাবুন, টুলু ও দিলীপ/ শিলিগুড়ি; শাশ্বতী দত্ত/ শিলিগুড়ি;

বলো তো আমি কে-র উত্তরঃ আমি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' গল্পের নায়ক বিমল।

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন :

১। নিজেকে রক্ষা করতে কোন সাপ বলের মতো গোল পাকিয়ে যায়?

২। মুখের মধ্যে বাচ্চা মাছকে পুরেও বড় মাছ তাদের খায় না। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কারা করে থাকে?

৩। একটা ম্যাগনেটকে দুটুকরো করলে তার দুটো অর্ধাংশ পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে দুটো ছোট ম্যাগনেট। কেন?

৪। কোথায় আছে আকাশের রেলপথ?

৫। ইংলন্ডে সবথেকে বড় আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা 'রয়টার' যিনি স্থাপন করেন তিনি কিন্তু জাতিতে ইংরেজ ছিলেন না। তাঁর নাম কি?

উত্তর :

১। পশ্চিম আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে রয়েল পাইথন নামে এক ধরনের সাপ আছে যারা নিজেদের রক্ষা করতে পাকিয়ে গিয়ে প্রায় একটা নিটোল বলের আকার ধারণ করে। এই অদ্ভুত স্বভাবের জন্য এদের নামই হয়ে গেছে 'বল পাইথন'। পোষা পাইথনকে ইচ্ছে করলে এমনিভাবে পাকিয়েও দেওয়া যায়।

২। মাউথব্রুডার নামে এক ধরনের মাছ। এদের ছোট বাচ্চারা ঝাঁক বেঁধে মা-বাবার মাথার চারপাশে সাঁতরে বেড়ায়। আর বিপদ বুঝলেই চট করে যে কেউ একজনের মুখের ভেতর গিয়ে ঢোকে। মা বা বাবা তাদের কিন্তু খেয়ে ফেলে না। বরঞ্চ নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের বের করে দেয়।

৩। এর কারণ প্রত্যেক ম্যাগনেটের এক প্রান্তে থাকে দক্ষিণ মেরু আর এক প্রান্তে থাকে উত্তর মেরু। একটা মেরুকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে পাওয়া অসম্ভব। তাই কোনো ম্যাগনেটকে দুটুকরো করা হলে টুকরোগুলের দুইপ্রান্তে নতুন ভাবে বিপরীত দুই মেরু এসে যায়।

৪। পেরুতে। এই রেলপথ পাহাড়ের এত উঁচু দিয়ে গেছে যে এই পথে যে সব ট্রেন চলাচল করে সেগুলোতে যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য অক্সিজেনের সরঞ্জাম রাখা হয়। উঠতে উঠতে একটা জায়গায় রেলপথটা পৌঁছায় মাটি থেকে ৩ মাইল ওপরে। ইউরোপের সবথেকে উঁচু শৃঙ্গ মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এর থেকে আর একটু উঁচু। এত উঁচুতে অবস্থিত বলেই এর নাম হয়েছে 'আকাশের রেলপথ'। রাজধানী লিমার কাছাকাছি কালাও বন্দরে শুরু হয়ে সুউচ্চ আন্ডিজ পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এটি শেষ হয়েছে হুয়ানকেও-তে। পর্যটকদের কাছে এই রেলপথে ভ্রমণ এক দারুণ ব্যাপার।

৫। পল রয়টার। ইনি ছিলেন একজন জার্মান। ১৮৫১ সালে তিনি সংবাদসংস্থাটি স্থাপন করেন।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বিলি চাইছিলো বড়দিনের দিন ভালো খেলে সকলের নজর টানতে

(৬৫)

বিলি ডেন প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের এক জোড়া ছেঁড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। বিলি হঠাৎই মুরফিল্ড অ্যাভিনিউ-এর পক্ষে বড়দিনের দিন খেলার সুযোগ পেয়ে গেলো। একজন বন্ধুমনোভাবাপন্ন ক্রীড়া-সাংবাদিকের সঙ্গে মাঠে বিলির আলাপ হয়েছিলো। বিলির খেলার প্রশংসা করে তিনি স্থানীয় কাগজে অনেক কিছু লিখে বসলেন.....

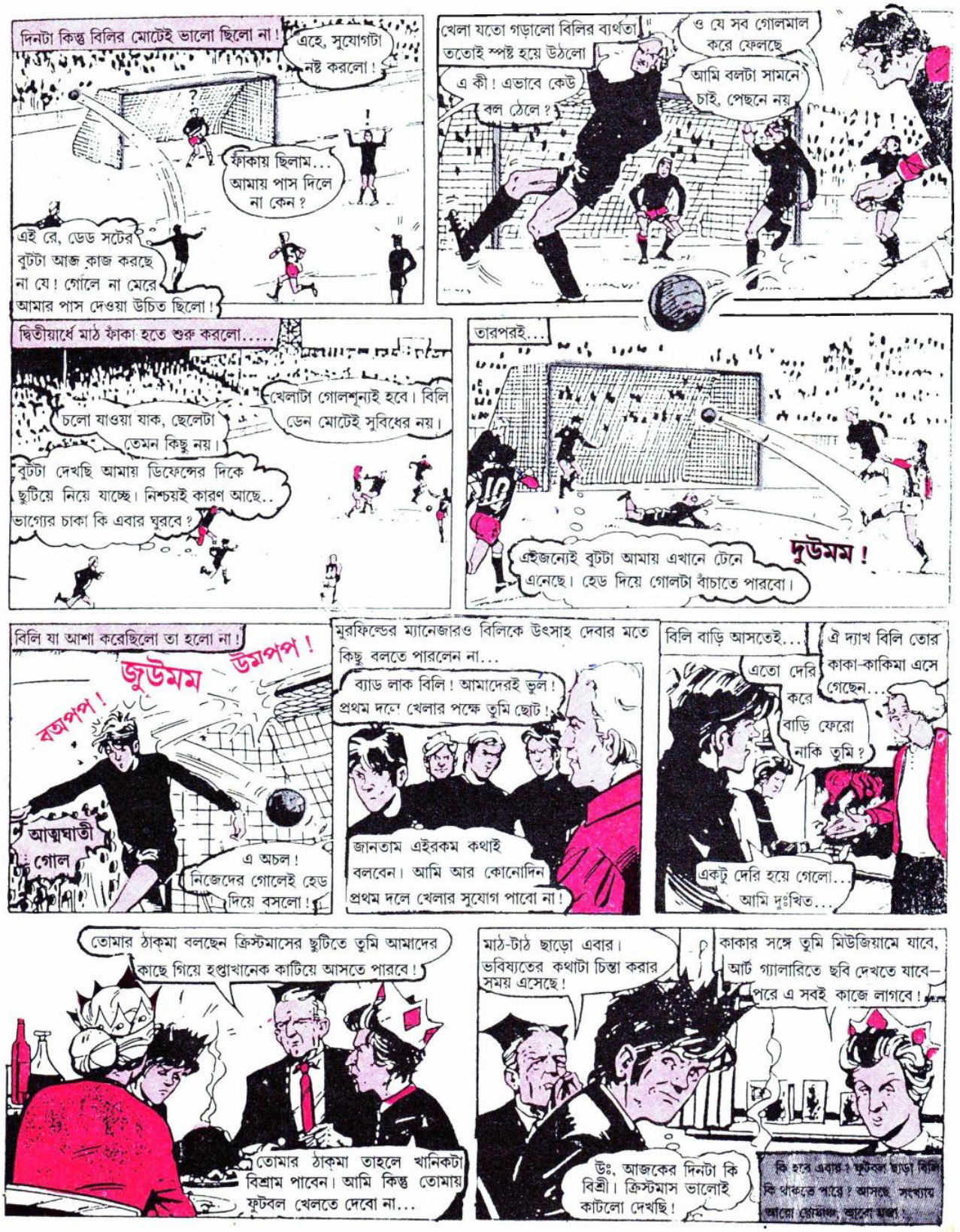

দিনটা কিন্তু বিলির মোটেই ভালো ছিলো না!
এহে, সুযোগটা নষ্ট করলো!
ফাঁকায় ছিলাম... আমায় পাস দিলে না কেন?
এই রে, ডেড সটের বুটটা আজ কাজ করছে না যে! গোলে না মেরে আমার পাস দেওয়া উচিত ছিলো!
খেলা যতো গড়ালো বিলির ব্যর্থতা ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠলো
এ কী! এভাবে কেউ বল ঠেলে?
ও যে সব গোলমাল করে ফেলছে
আমি বলটা সামনে চাই, পেছনে নয়
দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ ফাঁকা হতে শুরু করলো.....
খেলাটা গোলশূন্যই হবে। বিলি ডেন মোটেই সুবিধের নয়।
চলো যাওয়া যাক, ছেলেটা তেমন কিছু নয়।
বুটটা দেখছি আমায় ডিফেন্সের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কারণ আছে.. ভাগ্যের চাকা কি এবার ঘুরবে?
তারপরই...
দুউমম!
এইজন্যেই বুটটা আমায় এখানে টেনে এনেছে। হেড দিয়ে গোলটা বাঁচাতে পারবো।
বিলি যা আশা করেছিলো তা হলো না!
বত্রপপ!
জুউমম
উমপপ!
আত্মঘাতী গোল
এ অচল! নিজেদের গোলেই হেড দিয়ে বসলো!
মুরফিল্ডের ম্যানেজারও বিলিকে উৎসাহ দেবার মতে কিছু বলতে পারলেন না...
ব্যাড লাক বিলি! আমাদেরই ভুল! প্রথম দলে খেলার পক্ষে তুমি ছোট!
জানতাম এইরকম কথাই বলবেন। আমি আর কোনোদিন প্রথম দলে খেলার সুযোগ পাবো না!
বিলি বাড়ি আসতেই...
এতো দেরি করে বাড়ি ফেরো নাকি তুমি?
ঐ দ্যাখ বিলি তোর কাকা-কাকিমা এসে গেছেন...
একটু দেরি হয়ে গেলো... আমি দুঃখিত...
তোমার ঠাকমা বলছেন ক্রিস্টমাসের ছুটিতে তুমি আমাদের কাছে গিয়ে হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসতে পারবে!
তোমার ঠাকমা তাহলে খানিকটা বিশ্রাম পাবেন। আমি কিন্তু তোমায় ফুটবল খেলতে দেবো না...
মাঠ-টাঠ ছাড়ো এবার। ভবিষ্যতের কথাটা চিন্তা করার সময় এসেছে!
কাকার সঙ্গে তুমি মিউজিয়ামে যাবে, আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখতে যাবে— পরে এ সবই কাজে লাগবে!
উঃ, আজকের দিনটা কি বিশ্রী। ক্রিস্টমাস ভালোই কাটলো দেখছি!
কি হবে এবার? ফুটবল ছাড়া বিলি কি থাকতে পারে? আসছে সংখ্যায় আরো রোমাঞ্চ, অনেক মজা!

সত্যি !

আশ্চর্য হিসাব

জ্ঞান প্রকাশ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টি হারান। তারপরই এক আশ্চর্য ক্ষমতা আয়ত্তে আনেন তিনি। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় অমুক বছরের অমুক তারিখটা কোন দিন পড়ছে তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি নির্ভুল উত্তর দিয়ে দেন। তারিখ না বলে যদি দিনের উল্লেখ করা হয় তো সেই দিনে কি তারিখ হবে তাও তিনি নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারেন। হিসেবটা তিনি করেন মনে মনে, সম্পূর্ণ নিজস্ব এক পদ্ধতিতে। সত্যিই আশ্চর্য, তাই না?

সাবান সৌখ

বিলাসপুরের পি. সি. মিশ্রর শখটা বড় অদ্ভুত। পাথর মাটি ফেলে মূর্তি গড়তে তিনি বেছে নিয়েছেন সাবানকে। বেশ কয়েকটা সাবান লাগে একটা মডেল তৈরি করতে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাজমহল, পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট শিবের মন্দির আর মহাভারতের একটি যুদ্ধের দৃশ্য। এক একটা মডেল করতে তাঁর সময় লাগে পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিন।

বাল্ব স্কেট

এতদিন জানা ছিল বাচ্চারা রোলার স্কেট পায়ে লাগিয়েই হাঁটতে ভালোবাসে। কিন্তু আমেদাবাদের নীতিন হরসোরা সেসব ধ্যান-ধারণাকে উল্টে দিয়েছে। নীতিন হাঁটে পায়ে কাচের বাল্ব বেঁধে। জিনিসটা তার নিজেরই তৈরি। দুটো লম্বা ফালি কাঠের মাঝখানে নীতিন লাগিয়ে নিয়েছে দুটো বাল্ব। বাল্বের মুখগুলো নিচের দিকে অর্থাৎ মাটির দিকে। আর বাল্বের হোল্ডার দুটো জুতোর শুকতলার নিচের ফালিটায় আটকানো থাকে। এ অবস্থায় নীতিনকে হাঁটতে হয় খুব আলতো করে সাবধানে।

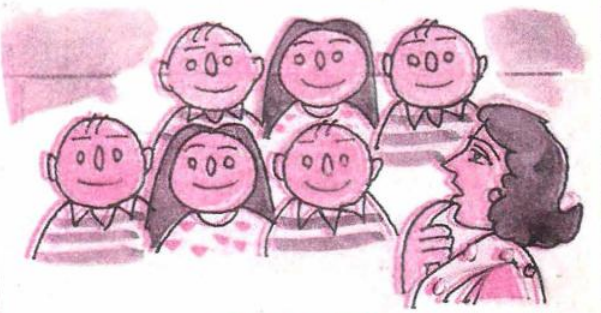

যমজের ফ্যাসাদে

১৯৯১-৯২-এর শিক্ষাবর্ষে লক্ষ্ণৌয়ের রেড হিল স্কুলে ভারি এক মজার ঘটনা ঘটে। সেবার প্রাইমারি সেকসানে যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ছ জোড়া ছাত্র-ছাত্রী ছিল যমজ। যমজদের মধ্যে একজনরাই ছিল শুধু এক ভাই আর এক বোন। বাদবাকি হয় দুজনেই ভাই নয় দুজনেই বোন। ভাব একবার তাদের টিচারদের অবস্থাটা। কোনটা যে কে কেবলই গুলিয়ে ফেলছিলেন তাঁরা।

কলির ভীম

ত্রিচুরের পি. কে. রাপ্পাইয়ের নামই হয়ে গেছে কলির ভীম। কেন জানো? কারণ তিনি ঠিক ভীমের মতোই খেতে পারেন। ঘুম থেকে উঠেই তাঁর জলখাবার হচ্ছে ৭০টা ইডলি আর ২ লিটার কফি। বেলা ১১টায় আবার তাঁর খিদে পায়। তখন তিনি এক মিনি লাঞ্চ সারেন। তারপর ১টার সময় পেট ভর্তি করে খান পাহাড়প্রমাণ ভাত, ডাল আর সবজি। বিকেলের চায়ের সঙ্গে থাকে উপমা। আর সন্ধ্যে ৭টায় যখন রাতের খাবার খান তখন মেনু হচ্ছে সবজি সহকারে ৩০ খানা চাপাটি বা পরোটা। একবার এক ভোজন প্রতিযোগিতায় রাপ্পাই একাই খেয়েছিলেন ৭৫০ খানা ইডলি আর ৩০ খানা কলা। ইচ্ছে করলে একসঙ্গে তিনি খেতে পারেন ১০০ খানা মশলা ধোসা, ৮৫টা কলা, আর ২৫ লিটার পায়েস বা ক্ষীর।

উল্টো মানুষ

অমরাবতীর সতীশ গণপত রাও ঘিনিকার পা শূন্যে তুলে হাতের ওপর ভর দিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুক্তাগিরি পাহাড়ের ৩২০টা সিঁড়ি নেমে এসে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে তাঁর সময় লেগেছিল ৪ মিনিট ২৬ সেকেন্ড।

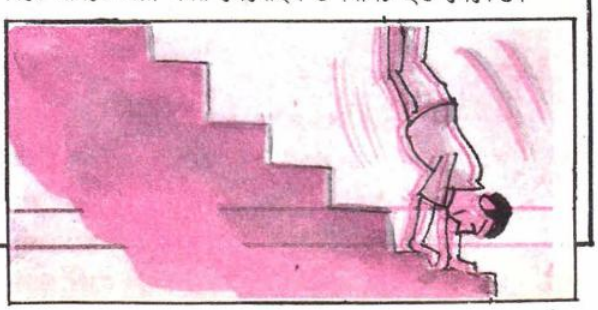

জীবন থেকে নেওয়া

স্যান্ডি ম্যাকের গল্প

আরতি বসু

কোপেনহেগেনের অনেক মানুষের কাছেই দৃশ্যটা খুব পরিচিত। বিশেষ করে যাঁদের বাড়ি বড় বড় দোকানপাট, হোটেল রেস্তোরাঁ কিংবা বাজারের লাগোয়া তাঁদের কাছে। প্রতিদিনের চেনা দৃশ্য। রোজ সকালে যেমন সূর্য ওঠে, কাগজওয়ালা কাগজ বিলি করে, দুধওয়ালা দুধের বোতল রেখে যায়, ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ যায়, বড়রা অফিস-কাছারি দৌড়য় ঠিক তেমনি। তবে অত সকালে নয়, আর একটু দেরিতে। বেলা আটটার একটু পরেই। রেশমের মতো চকচকে সুন্দর একটা কালো ঘোড়া ভিল ক্রিশ্চিয়ানসেন কোম্পানির মালবোঝাই মস্ত গাড়িটা টেনে টগবগিয়ে এসে পড়ে শহরের রাজপথে। দোকান-বাজারের সামনে, বড় হোটেল রেস্তোরাঁর সামনে, একবার করে দাঁড়ায়। মালপত্র নামানো হয়, তারপর আবার ছুটতে শুরু করে। ওর নাম স্যান্ডি ম্যাক। আর গাড়ির সহিসের আসনে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন যে মানুষটি তাঁর নাম হের পিটারসন। কোপেনহেগেনের দোকানে বাজারে ভিল ক্রিশ্চিয়ানসেন কোম্পানির মাল পৌঁছে দিতে দিতে প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। কম দিন তো নয়, পাক্কা চল্লিশটা বছর। তার মধ্যে এই স্যান্ডি ম্যাকই তো সঙ্গে রয়েছে গত চোদ্দ বছর ধরে। কোম্পানির উর্দিপরা এই পিটারসনকেও তাই সকলেই চেনে। বয়েস হওয়ার দরুন ইদানিং চশমা নিয়েছেন। বরাবরই গম্ভীর, কথাবার্তা বরাবরই খুব কম বলেন। কিন্তু তাই বলে মানুষটি মোটেই খারাপ নন। আচার-ব্যবহার খুব ভাল। ব্যবসায়ী, দোকানদার, ট্রাফিক পুলিশ, পরিচিত পথচারী—সবাইকেই সসম্ভ্রমে সুপ্রভাত জানান, কাজ শেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেন।

ঠিক ওঁর মতোই আভিজাত্যপূর্ণ হাবভাব স্যান্ডি ম্যাকের। সেও অল্প মাথা দুলিয়ে সুপ্রভাত আর ধন্যবাদ জানায় মনিবের মতো। মনিবের মতোই ধীর, সভ্যভব্য, কর্তব্যসচেতন। ট্র্যাফিক সিগনালে যদি অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়, কিংবা যদি কোনো অন্যমনস্ক পথচারী হঠাৎ সামনে এসে পড়েন স্যান্ডি ম্যাক একটুও রেগে যায় না। ও বিরক্ত হয় শুধু মোটরগাড়ি দেখলে। যখন তখন পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে যাওয়া গাড়িগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারে না স্যান্ডি ম্যাক। পা ঠুকে মাথা নেড়ে চেঁচিয়ে তাদের ধমকায়। তার মতো তার মনিবের কাছেও মোটরগাড়ি ভীষণরকম অপছন্দের জিনিস। মোটে বরদাস্ত করতে পারেন না। দেখলেই ভুরু কুঁচকে ওঠে। কিন্তু ঐটুকুই, তার বেশি আর কিছু করেন না। স্যান্ডি ম্যাকও শুধু ওদের ধমক দিয়েই চুপ করে যায়। অন্যের ক্ষতি করতে ভালোবাসে না সে-ও।

কেবল একদিন স্যান্ডি ম্যাককে রাগতে দেখেছিল সবাই। সেদিন সে এত রেগে গিয়েছিল যে নিজেকে সামলাতে পারেনি। সেটা ১৯৪৪ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও চলছে। জার্মান সৈন্য কোপেনহেগেন দখল করে রেখেছে। সেই সময় হঠাৎ একদিন শহরের একটা রাস্তায় ডেনিশ পুলিশের সঙ্গে একদল জার্মান সৈন্যের মুখোমুখি লড়াই বেধে গেল। দুপক্ষই মরিয়া। একটা দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল স্যান্ডি ম্যাক। পিটারসন গেছিলেন ভেতরে মাল তুলতে। স্যান্ডি ম্যাকের দুই কানের পাশ দিয়ে গুলি ছুটছে। বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে সে দেখল ব্যাপারটা। তারপরই হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। কী যে হলো তার! ভাবল বোধহয় যথেষ্ট হয়েছে, বদমেজাজী বেয়াদপ জার্মানগুলোকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বিকট চিৎকারের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে উঠে মালবোঝাই ভারি গাড়িটা নিয়ে ছুটতে শুরু করল জার্মান সৈন্যদের দিকে। থমকে গেল জার্মান সৈন্যরা। তারপরই দে ছুট। যে যেদিকে পারল পালাল। এমন ঘোড়া ট্যাঙ্ক তারা জন্মে দেখেনি। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে স্যান্ডি ম্যাক আবার গুটিগুটি গিয়ে দাঁড়াল সেই দোকানের সামনে যেখানে তার মনিব তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এই ঘটনার কথা। যে শোনে সে-ই অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য, এত বুদ্ধি! এত সাহস! বন্দুককে ভয় পায় না! আচ্ছা, ও কি করে বুঝল যে ওগুলো জার্মান, আমাদের শত্রু? সেই থেকেই ছোটদের কাছে স্যান্ডি ম্যাক যে সে ঘোড়া নয় রূপকথার পক্ষিরাজ।

এর পর অনেকদিন কেটে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। গুলি গোলা, বোমা-সাইরেনের আতঙ্ক আর নেই। সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে মানুষ। হের পিটারসন ঠিক করলেন পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে একটু সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসবেন। পরিশ্রমে আর যুদ্ধের আতঙ্কে ভুগে ভুগে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ক'টা দিন সমুদ্রের হাওয়ায় শরীরটাকে আবার চাঙ্গা করে আনবেন।

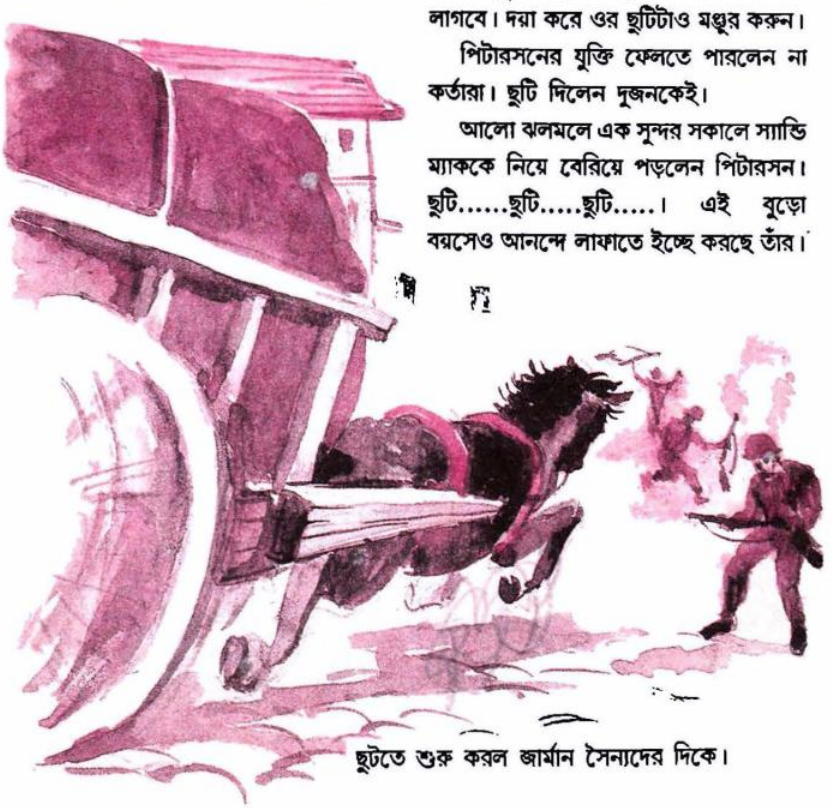

ছুটতে শুরু করল জার্মান সৈন্যদের দিকে।

কিন্তু পিটারসনের ছুটির দরখাস্ত পড়ে ভিল ক্রিশ্চিয়ানসেন কোম্পানির কর্তাদের চোখ উঠল কপালে। পিটারসন শুধু নিজের জন্যেই ছুটি চাইছেন না, ছুটি চাইছেন স্যান্ডি ম্যাকের জন্যেও! কারণ তারও নাকি একটু গায়ে হাওয়া লাগানো দরকার। পিটারসনকে ডেকে পাঠিয়ে কর্তারা বললেন, আপনার ছুটি অবশ্যই আমরা মঞ্জুর করলাম। কিন্তু স্যান্ডির—

ওঁদের আর কথা শেষ করতে দিলেন না পিটারসন, বললেন, কেন স্যার, ও কি কিছু কম পরিশ্রম করে আপনাদের জন্য? দেখুন, এই যুদ্ধের হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও ও ঠিক কাজ করে গেছে। এখন ও আমারই মতো ক্লান্ত, অবসন্ন। সুতরাং আপনাদের কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীর মতো ওরও ছুটির দরকার। জন্মের পর থেকে ও একদিনও শহরের বাইরে যায়নি। তাছাড়া চোদ্দ বছর ধরে আপনাদের কাজ করে যাচ্ছে। আমি জানি সমুদ্রের খোলা হাওয়া ওর ভীষণ ভাল লাগবে। দয়া করে ওর ছুটিটাও মঞ্জুর করুন।

পিটারসনের যুক্তি ফেলতে পারলেন না কর্তারা। ছুটি দিলেন দুজনকেই।

আলো ঝলমলে এক সুন্দর সকালে স্যান্ডি ম্যাককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিটারসন। ছুটি.....ছুটি.....ছুটি.....। এই বুড়ো বয়সেও আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

স্যান্ডি প্রথমটা তার অভ্যস্ত পদক্ষেপে চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু এটা কি হচ্ছে? এ রাস্তা তো তার চেনা নয়! গাড়ি নেই, মানুষ নেই, ফাঁকা রাস্তার দুধারে শুধু পাতাভরা বিরাট বিরাট গাছ! লাগামে একবারও টান পড়ছে না! তার ওপর তার মনিব গলা ছেড়ে গান গাইছেন! খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে চলার পর দাঁড়িয়ে পড়ল স্যান্ডি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মনিবের দিকে।

পিটারসন ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি রে। ছুটি পেয়েছি, পনেরো দিনের লম্বা ছুটি। সমুদ্র দেখবি, সাঁতার কাটবি, মাঠে মাঠে দৌড়বি। খুব ভালো লাগবে দেখিস।

স্যান্ডি কান নাড়ল, মাথা দোলাল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। সমুদ্রতটের কাছাকাছি একটা সরাইখানায় পৌঁছে পিটারসন স্যান্ডির লাগাম খুলে দিলেন। পাশেই মস্ত বড় মাঠ। সবুজ ঘাসে ভরা। স্যান্ডি মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে মনিবের মুখের দিকে তাকাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলতে চাইল, এখানে এলে কেন? এখানে আমি কি করব?

পিটারসন বললেন, যা, দৌড়ো। এমন ফাঁকা মাঠ, খোলা আকাশ দেখেছিস কখনো? যত পারিস আনন্দ করে নে।

স্যান্ডি খুব সন্তর্পণ ভঙ্গিতে এক পা দু পা এগোল। সে চেনে শুধু শহরের বাঁধানো রাস্তা। এমন নরম নরম জমিতে সে পা রাখেনি কোনোদিন। ঈর পায়ে একটু ঘুরে বেড়াবার পর স্যান্ডি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সকাল থেকে কী ঘটছে সব আর একবার বুঝে নেবার চেষ্টা করল বোধহয়। আর তারপরই তীক্ষ্ণ একটা হ্রেষাধ্বনি দিয়ে বাঁধভাঙা আনন্দে ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করল। ছুটছে....ছুটছে, লাফাচ্ছে, বুনো ঘোড়ার মতো লাথি ছুঁড়ছে, আবার কখনো ঘন ঘাসে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকছে। একটু একটু দাঁতে কেটে তার স্বাদও নিচ্ছে। ওকে খুশিমনে ঘুরতে দেখে পিটারসন সরাইখানার মধ্যে ঢুকলেন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পিটারসন দেখেন অসন্তুষ্ট মুখে স্যান্ডি দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। খোলা মাঠে, খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে তার মোটেই ভালো লাগেনি। শহরের আস্তাবল এর চেয়ে ঢের ভালো, ঢের আরামের। পিটারসন ওকে খেতে দিয়ে আদর করে বললেন, দু একদিন থাক, দেখবি এটাই বেশি ভালো। তখন আর ফিরতেই চাইবি না। স্যান্ডি তাঁর কথা কানে তুলল বলে মনে হলো না। ভারি মুখে খেল, ভারি মুখেই মনিবের সঙ্গে বেড়াতে বেরুল।

পিটারসনের পিছু পিছু হাঁটছে স্যান্ডি। হাঁটতে হাঁটতে রাগটাও কমছে একটু একটু করে। আসলে এই জায়গাটা ভারী অদ্ভুত। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। মাঠভরা ঘাস আর বুনো ফুলের গন্ধ যেন নেশা ধরায়। স্যান্ডি মাথা নামিয়ে ফুল শুঁকল, দু একটা চিবিয়েও দেখল। তারপরই চোখ গেল মাঠের মধ্যে চরে বেড়ানো গরু, ভেড়া আর শুয়োরছানাদের দিকে। খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেল সবার সঙ্গে। পিটারসন দেখলেন স্যান্ডি ওঁর দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাড়া দিল, সেইসঙ্গে মৃদুস্বরে জানিয়ে দিল, ভারি সুন্দর জায়গায় এনেছ তো! তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দিই।

ছুটি থেকে ফিরে পিটারসন যখন তাঁর সহকর্মীদের কাছে এসব গল্প করছিলেন, তখন তারা তাঁর কথা প্রথমটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল, হ্যাঁ, স্যান্ডি অমনি বলল, তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দিই। পাগল আর কাকে বলে! উত্তরে পিটারসন বলেছিলেন, তোমাদের এইরকমই মনে হবে বটে। তোমরা তো জানো না ও কত রকম ভাবে ডাকতে জানে। ওর সেই সব ডাক আমি চিনি। তাই আমি বুঝতে পারি ও কী ভাবছে, কী বলছে। তর্ক ছেড়ে এখন বল, শুনবে কি আমাদের ছুটির গল্প?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনব। বল তুমি।

জানো, স্যান্ডি সবচেয়ে মজা পেয়েছিল ছোট্ট ছোট্ট মুরগীছানা দেখে। দেখতে পেলেই হলো, অমনি তাদের পেছনে ঘুরতে থাকবে। তারা কী খাচ্ছে, কী করছে, ভয় পেলে মায়ের ডানার তলায় কেমন করে লুকোচ্ছে—সব দেখা চাই। মা-মুরগী-গুলোরও খুব ভাব হয়েছিল স্যান্ডির সঙ্গে। কিন্তু রাজহাঁসগুলো বড্ড পাজি। আমার স্যান্ডি একদিন যেই একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ভাব করতে গেছে অমনি দিল ভীষণ জোরে ঠুকরে! তারপর গোটা দলটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে প্যাঁক প্যাঁক করে তেড়ে এল! স্যান্ডি তো ভয়ে বাঁচে না, দৌড়ে পালিয়ে এল আমার কাছে। দেখি তখনও বেচারা ঠকঠক করে কাঁপছে।

ওখানকার চাষীদের ঘোড়াগুলোর সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে স্যান্ডি। কিন্তু ও বেশ জানতো যে ওরা আলাদা জাতের। স্যান্ডির মতো ওদের চামড়া চকচক করে না। কেউ যত্ন করে আঁচড়ে দেয় না বলে ওদের লেজ আর কেশর জটাপড়া, নোংরা। ওদের হাঁটু অবধি মাটিমাখা। স্যান্ডি তাই ভাব করলেও ওদের কাছে যায়নি বিশেষ, দূরে দূরেই থেকেছে। সে তোমরা দেমাকীই বলো বা নাকউঁচুই বলো, এ ব্যাপারে স্যান্ডি বেশ খুঁতখুঁতে।

ও কিন্তু একটা জিনিস দেখে সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেটা হলো সমুদ্র। বালিতে পা দিতেই ওর অস্বস্তি। শুকনো বালি পায়ের তলা থেকে সরসর করে সরে সরে যায় আর ভিজে বালিতে ঠাণ্ডা লাগে। কী করে বেচারা! প্রথম যেদিন আমি জলে নামলাম সেদিন সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দূরে। আমি যত বলি, আয় এখানে, দেখ কী মজা, ও তত বলে, উঠে এসো না, কী করছ এতক্ষণ? পরদিন ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেই আমি সাঁতার কাটলাম অনেকক্ষণ। ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে থাকতে থাকতে মনে হলো একটু চিৎ সাঁতার কাটার চেষ্টা করে দেখি তো এখনো পারি কি না। তা সাঁতার কাটার সুযোগই দিল না স্যান্ডি। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ছুটে এল আমার দিকে। আমি নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ও থমকে গেল, তারপর ফিরে চলল তীরের নিরাপদ আশ্রয়ে। যেতে যেতে হঠাৎ ও আবিষ্কার করে ফেলল জল ছেটানোর মজা। তারপর কী খুশি! কী খুশি! ঝপঝপিয়ে

এদিক ছুটছে ওদিক ছুটছে, কী যে করছে...। সে দৃশ্য যদি তোমরা দেখতে ! আহা ! এরপর তো জল থেকে ওকে টেনে আনাই মুশকিল হয়ে উঠেছিল !

কিন্তু মাত্র তো পনেরোটা দিন। দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গেল। ফিরছি যখন, তখন বুঝতে পারলাম স্যান্ডির শক্তি কত বেড়ে গেছে মাত্র এই ক'দিনে। শহরের কাছাকাছি এসে হঠাৎ দেখি ওর চলা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু চলে আর ফিরে ফিরে তাকায় আমার দিকে। বুঝলাম বাঁধানো রাস্তায় পা ফেলতে ভয় পাচ্ছে স্যান্ডি। ওকে সাহস দিলাম। বোঝালাম, ছুটি ফুরিয়ে গেছে স্যান্ডি। এখন আমাদের আবার কাজে বেরোতে হবে। রোজ। ঠিক করে চল, নইলে লোকেরা কী ভাববে ? সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিল স্যান্ডি। একমুহূর্তের জন্যে একটু থেমেই ফের টক্‌টক্ টক্‌টক্ করে শহুরে ছন্দে ছুটতে শুরু করল।

স্যান্ডি ম্যাকের ছুটি কাটানোর এই গল্প একদিন হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল কোপেনহেগেনে। এক রেস্তোরাঁর মালিক বিরাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলেন স্যান্ডির ছুটি থেকে ফিরে আসার সম্মানে। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হলো, 'ঘোড়ার অবকাশ যাপন' সম্পর্কিত যাবতীয় খবর। গোটা ডেনমার্কের মানুষ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সেই খবর পড়ে। একটি সংস্থা তো কোপেনহেগেনের বাইরে মস্ত বড় একটি চারণভূমিই কিনে ফেললেন ঘোড়াদের গ্রীষ্মাবকাশ কাটানোর ব্যবস্থা করতে। হের পিটারসনকে এ সংস্থার বিশেষ সম্মানীয় সদস্য করে নেওয়া হলো। শহরের আর যে সব কোম্পানি ঘোড়া রাখত মাল বইবার জন্য তারা সবাই দরখাস্ত করল, যাতে তাদের ঘোড়ারাও আনন্দে সেখানে ছুটি কাটাতে পারে। আর ভিল ক্রিশ্চিয়ানসেন

আমি ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কোম্পানি সবার আগে ঘোষণা করে দিল স্যান্ডি ম্যাক প্রতি গ্রীষ্মেই পনেরো দিনের ছুটি পাবে সমুদ্রতীরে বেড়াবার জন্যে। হৈচৈ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ডেনমার্কের পার্লামেন্টেও ঘোড়াদের ছুটি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা তাই নিয়ে শুরু হয়েছিল আলাপ-আলোচনা।

দেখেশুনে হের পিটারসন শুধু বলেছিলেন, এ নিয়ে এত হৈচৈ করার কি আছে ? ওরা যখন আমাদেরই মতো খাটে তখন আমাদের মতো ছুটি তো পাবেই। এ আর বেশি কথা কি ?

ফ্রেডারিক সনডার্নের 'এ হর্স দ্যাট ওয়েন্ট অন ভেকেশন' অবলম্বনে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লি: ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং রামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অনুবাদ সিরিজ

বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় দেব সাহিত্য কুটীরের নতুন সংযোজন

জ্যাক লণ্ডন-এর
হোয়াইট ফ্যাং
কল অব দ্য ওয়াইল্ড

রিচার্ড হেনরি ডানা-র
টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট

হেনরি হল কেইন-এর
দ্য বণ্ড ম্যান

জোয়ান রুডলফ ওয়াইজ-এর
ইস ফ্যামিলি রবিনসন

র্লস কিংসলি-র
ইপেশিয়া

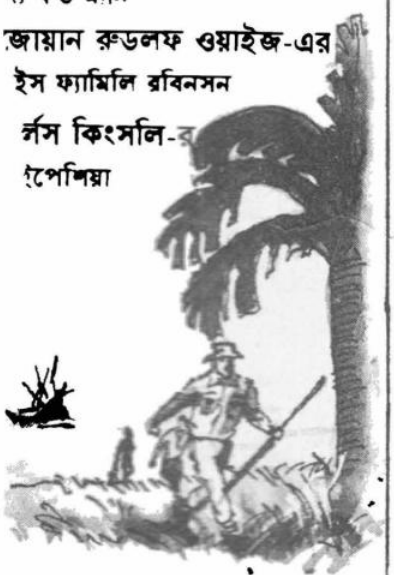

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌-এর
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ মুন
দ্য ওয়ার অব দ ওয়ার্ল্ডস্‌
ইনভিজিবল ম্যান
দ্য স্লীপার অ্যাওয়েক্‌স্‌

.র্ক টোয়েনের
অ্যাডভেঞ্চারস্‌ অব টম সইয়ার
দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্‌
এ কনেক্টিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থাস কোর্ট
দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার
াডনহেড উইলসন

ভিক্টর হ্যুগোর
লা মিজারেবল
ট্রয়লার্স অব দ সী
হাঞ্চব্যাক অফ নংরদাম
দ্য ম্যান হু লাফ্‌স্‌

এরিক মারিয়া রেমার্ক
দি ব্ল্যাক অবলিস্ক
অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট

এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট

র‍্যাফেল সাবাটিনির
অ্যাক্রস দ্য পিরেনিজ
দি লস্ট কিং

জুলে ভার্ণের
জার্নি টু দ্য সেণ্টার অব দ্য আর্থ
রাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ

চার্লস ডিকেন্সের
নিকোলাস নিকোলবি
এ টেল অব টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
ডেভিড কপারফিল্ড
অলিভার টুইস্ট

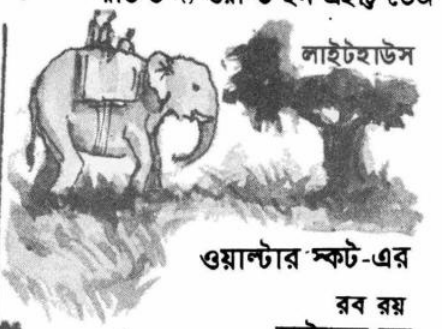

লাইটহাউস

হেনরি রাইডার হাপার্ড-এর
দি মুন অব ইজরায়েল
কিং সলোমন্‌স্‌ মাইন্‌স্‌

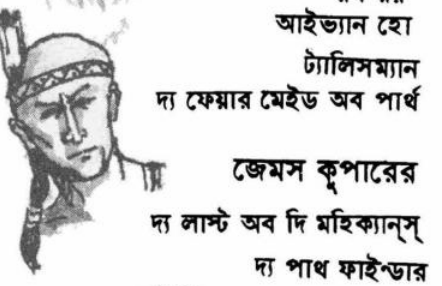

ওয়াল্টার স্কট-এর
রব রয়
আইভ্যান হো
ট্যালিসম্যান
দ্য ফেয়ার মেইড অব পার্থ

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
কিডন্যাপ্‌ড
ব্ল্যাক অ্যারো
ট্রেজার আইল্যাণ্ড
ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড
দ্য বটল ইম্প

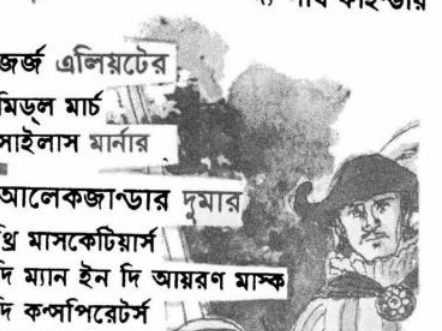

জেমস কুপারের
দ্য লাস্ট অব দি মহিক্যান্‌স্‌
দ্য পাথ ফাইণ্ডার

জর্জ এলিয়টের
মিড্‌ল মার্চ
সাইলাস মার্নার

আলেকজাণ্ডার দুমার
থ্রি মাসকেটিয়ার্স
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক
দি কন্সপিরেটর্স
কাউণ্ট অব মন্টিক্রিস্টো
ব্ল্যাক টিউলিপ
কাউণ্টেস দ্য চার্নি

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

চুল নিয়ে সমস্যা ?

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

ডাঃ সরকার বলেন—

চুলের কোনও রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই শুধু মাথায় ওষুধ লাগালেই হবে না সঙ্গে ওষুধ খেতেও হবে।

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান,
আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধকরে, চুলের পুষ্টি জোগায়,
অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়,
চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়,
আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপ্‌ল অ্যাক্‌শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত
হোমিও ওষুধ

Allen

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন ৩৫-২৯৬১
এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ ২২৪/এইচ, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ
আবিষ্কার (সি,সি, আই-পুরস্কৃত)
ট্রায়োফার খাওয়ার সঙ্গে
আর্ণিকাপ্লাস লাগানোর ওষুধ।

ব্যবহার বিধি ঃ

আর্ণিকাপ্লাস-হেয়ার ভাইট্যালাইজার স্নানের পরে ও রাতে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় লাগান, সঙ্গে ট্রায়োফার-হেয়ার টনিকটিও-সেবন করুন সকালে ও রাত্রে, যত দিন না চুল নিয়ে সমস্যা দূর হয়।

বিপণন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১

allen's

অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ
আর্ণিকাপ্লাস অ্যাপার্টমেন্ট, শিয়ালদহ
৩৫, এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic
Medicine Manufacturers

Bringing Science To Life

Jupiter Emars Allen

Dr. SARKAR Group

Allen's Ad. India